দু' টাকা বারো আনা

তৃতীয় সংস্করণ

এই লেখকের—

উর্মি মুখর
অনুবর্ত্তন
দৃষ্টি প্রদীপ
অভিযাত্রিক
পথের পাঁচালী
অপরাজিত
আরণ্যক
মেঘমল্লার
মৌরী ফুল
জন্ম ও মৃত্যু
যাত্রাবদল
কিন্নর দল
আদর্শ হিন্দু হোটেল
বেণীগির ফুলবাড়ী
বিপিনের সংসার
দুই বাড়ী
কেদার রাজা
স্মৃতির রেখা
মরণের ডঙ্কা বাজে
চাঁদের পাহাড়
জগৎ

ট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকা
ধ্যায় কর্ত্তৃক মু

উৎসর্গ

সুহৃদ্বর
শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের
করকমলে

বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন পারিপার্শিক পরিবর্ত্তনে মনের মধ্যে যে [illegible] জাগে, আমার এই দৈনন্দিন লিপিতে তাহাই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। [illegible] কখনো অন্ধকারে, কখনো জ্যোৎস্না-স্নাত রজনীতে, কখনো সুখে, [illegible] দুঃখে, গহন পর্ব্বতারণ্যে বা জনকোলাহলমুখর নগরীতে, বিভিন্ন [illegible] সংস্পর্শে বা শান্ত নিঃসঙ্গতার মধ্যে মন যেখানে নিজেকে লইয়াই ব্যক্ত [illegible]—এই এই সব রচনার সৃষ্টি সেখানে। পুস্তকে বা পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে [illegible] জন্য এগুলি লিখিত হয় নাই। সেইজন্য বহুস্থলে এই রচনাগুলির মধ্যে এমন জিনিস দেখা দিয়াছে যাহা নিতান্তই ব্যক্তিগত। লিপিকৌশলের ইচ্ছা ইহাদের মূলে ছিল না—হয়তো দ্রুত ধাবমান রেলের গাড়ীতে, কিংবা পথচারী পথিকের স্বল্প অবসরে, পথিপার্শ্বের কোনো বৃক্ষতলে বা শিলাসনে যে সব রচনার উদ্ভব—লেখকমনের কারিকুরি প্রকাশের অবকাশ সেখানে কোথায়? যে অবস্থায় যেটি ছিল, অপরিবর্ত্তিত ভাবেই সেগুলি ছাপা হইয়াছে। আমার জীবনে ব্যক্তিগত অনুভূতির অতীত ইতিহাসের দিক হইতে ইহার মূল্য আমার নিজের কাছে [illegible] বেশি। বহু হারানো দিনের মনের ভাব ও বিস্মৃত অনুভূতিরাজি আবার স্পষ্ট হইয়া উঠে। যে সব অবস্থার মধ্যে আর কখনো পড়িব না, ক্ষণ[illegible] তাহার মধ্যে আবার ডুবিয়া যাই এগুলি পড়িতে পড়িতে,—ব্যক্তিগত [illegible] বাণীমূর্ত্তি দেওয়ার ইহার একটি বড় সার্থকতা বলিয়া মনে করি। আমার জীবনের ও জগতের বিদেশে যাঁহারা অবস্থিত—তাঁহারা এগুলি হইতে কি রস পাইবেন [illegible] জানি না, তবে একথা অনস্বীকার্য্য যে কৌতুক বা কৌতূহলের মধ্য দিয়া একটি নৈর্ব্যক্তিক আনন্দের অনুভূতি জীবনের সকল দর্শকের পক্ষেই [illegible]—[illegible] ইহার মূলে রহিয়াছে মানবমনের মূলগত ঐক্য।

শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

—জানুয়ারী, ১৯৩৯ [illegible]

উৎসব
৫
...ি পরে আজ আবার কল্‌কাতায় ফিরেচি। এই এক মাস দেশে ...চি অনেককাল পরে। মা মারা যাওয়ার পরে আর এত দীর্ঘদিন ...ক দেশে কখনো থাকিনি। এই এক মাস আমার জীবনের এক অপূর্ব ...র অধ্যায়। Dean inge যাকে ঠিক Joy of Life বলেচেন, তা ...ই গত মাসটীতে প্রাণে প্রাণে অনুভব করেচি। সেরকম নিভৃত, ...মল মাঠ ও কালো জল নদীতীর না হোলে মনের আধ্যাত্মিক পুষ্টি কেমন করে হবে? শহরের কর্ম্মকোলাহলে ও লোকের ভীড়ে তার সন্ধান কোথায় মিলবে? তাই যখন জটাখালির ভাঙ্গা কাঠের পুলটাতে দুধারের মজা গাঙ্‌ ও বাঁওড় এবং মাথার উপর অনন্ত নীলিমা, নীচে ঘনসবুজ গাছপালা, ধানক্ষেত, বিল, গ্রামসীমার বাঁশবন, মাটীর পথের ধারে পুষ্প-ভারনত বাব্‌লা গাছের সারি, দূরের বটের ডালে বৌ-কথা-ক' পাখীর ডাক—এসবের মধ্যে প্রতি বৈকালে গিয়ে বস্‌তাম, তখন মনে হোত আর শহরে ফিরে যাবার আবশ্যক নেই। (জীবনের সার্থকতা অর্থ উপার্জ্জনে নয়, খ্যাতি প্রতিপত্তিতে নয়, লোকের মুখের সাধুবাদে নয়, ভোগে নয়—সে সার্থকতা শুধু আছে জীবনকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করার ভেতরে, বিশ্বের রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করবার আনন্দের মধ্যে, এই সব শান্ত সন্ধ্যায় বসে এই অসীম সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করায়।) সেকথা বুঝেছিলাম সেদিন, তাই সন্ধ্যার কিছু আগে জীবনের এই অনন্ত গতি-পথের কথা ভাবতে ভাবতে অপূর্ব্ব জীবনের আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার গ্রাহ্য না করেই কুঠীর মাঠের অন্ধকার-ঘন, নির্জ্জন ও শ্বাপদসঙ্কুল পথটা দিয়ে একা বাড়ী ফিরলাম। আর নদীর ধারে অপূর্ব্ব আকাশের রং লক্ষ্য করে তার পরদিনও ঠিক সেই মনের ভাব আবার অনুভব করেছিলাম।

এরকম এক একটা সময় আসে যখন বিদ্যুৎচমকে অনেকখানি অন্ধকার রাস্তা একেবারে দেখ্‌তে পাওয়ার মত সারা জীবনের উদ্দেশ্য ও গভীরতা যেন এক মুহূর্ত্তে জান্‌তে পারা যায়, বুঝতে পারা যায়। শুধু সৌন্দর্য্যই এই বিদ্যুৎ,—আলোর কাজ করে মানসিক জীবনে। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য বড় আপেক্ষিক বস্তু। একে সকলে চিন্‌তে পারে না, ধরতে পারে না। কানকে, চোখকে, মনকে তৈরী করতে হয়, সঙ্গীতের কানের মত সৌন্দর্য্যের জ্ঞান

রঙের একটা জিনিসের অস্তিত্ব আছে। শিমুলগাছের মাথাটার আকাশটার দিকে চেয়ে দেখে নিয়ে বামে নতিডাঙ্গার দিকে চোখ নিতেই রক্তমেঘস্তূপ যেন যুগান্তের পর্ব্বতশিখরের মত আকাশে স্বপ্নপটে—তার ওপারে যেন জীবন পারের বেলাভূমি আনন্দ আব মত সন্ধ্যায় ধূসর অন্ধকার একটু একটু চোখে পড়ে।

রোজ আমাদের বাড়ীর পাশের বাঁশতলার পথটা দিয়ে যেতে বাল্যের শত ঘটনা, কল্পনার আশা, দুঃখসুখের স্মৃতি মনে জেগে উঠে সব বনের প্রতি গাছপালায়, পথের প্রতি ধূলিকণায় যে পঁচিশ বৎসর এক গ্রাম্য বালকের সহস্র সুখদুঃখ জড়ানো আছে, কেউ তা জান্‌বে আর এক শত বৎসর পরে তার ইতিহাস কোথায় লেখা থাক্‌বে? কো লেখা থাক্‌বে এক মুগ্ধমতি আট বৎসরের বালক জীবনে প্রথম গ্রা উত্তরমাঠে তার জ্যেঠামশায়ের সঙ্গে বেড়িয়ে এসে কি আনন্দ পেয়েছি কোথায় লেখা থাক্‌বে তার মায়ের-হাতে-ভাজা তালের পিঠে খাওয়ার আনন্দের কাহিনী? সেদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের ঘাটে স্নান কর্ত্তে নে নতুন-ওঠা চতুর্থীর চাঁদের দিকে চোখ রেখে ভাবতে ভাবতে এইসব ক বেশী করে মনে জাগছিল। গোপাল নগরের বারোয়ারীর যাত্রা দেখ গিয়ে তাই সে ছেলেটার কথা মনে পড়লো যে আজ পঁচিশ বছর আ কৃষ্ণঘোষের তামাকের দোকানের বারান্দাতে বসে তার বাবার সঙ্গে যাত্রা দেখতে দেখতে দময়ন্তীর দুঃখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতো।

সে-সব কথা যাক্‌। অদ্ভুত এই জীবন, অপূর্ব্ব এই সৃষ্টির আনন্দ। নির্জ্জনে বসে ভেবে দেখো, মানুষ হয়ে উঠবে।

অনেককাল পরে গরীবপুরে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে খিনু ও তার বোন াণীর সঙ্গে দেখা হোল। আজ প্রায় ষোল বছর আগে ওদের বাসাতে ড়ীর ছেলের মত থাক্‌তুম। তখন আমিও বালক, ওরা নিতান্ত শিশু ই খিনুকে যেন আর চিন্‌তে পারা যায় না। এত বড় হয়ে উঠেচে, এত খতে সুন্দর হয়েচে। রাণীও তাই। কতক্ষণ তারা আমাকে কাছে দয়ে পুরানো দিনের গল্প কর্ত্তে লাগলো আপনার বোনেদের মত, ড়তে আর কিছুতে চায় না। শেষকালে রাণী তার শ্বশুর-বাড়ীর ঠিকানা র কল্‌কাতায় গেলেই যেন সে ঠিকানায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি, এ রোধ বার বার কর্ল্লে।

এবার আরও সকলের চেয়ে ভাল লেগেচে যেদিন রামপদর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে মোল্লাহাটি ছাড়িয়ে পাঁচপোতায় বাঁওড়ের মুখে গিয়েছিলুম। এক তালীবনশ্যাম গ্রামরাজি। আকাশের কি নীল রং, ইছামতীর কি কালো জল! নৌকাতে আসবার সময় জ্যোৎস্নারাত্রে নির্জ্জন কাশবনের ও জলের ধারের বন্যেবুড়ো গাছের ও মাথার উপরকার নক্ষত্রবিরল আকাশের কি অসীম সম্ভাব্যতার ইঙ্গিত।

এই আনন্দের দিনের ইতিহাস পাছে ভুলে যাই, তাই লিখে রেখে দিলুম। অনেককাল পরে খাতাখানা খুলে দেখতে দেখতে এইসব আনন্দের কাহিনী মনে পড়বে তাই।

একটা কথা আজকাল নির্জ্জনে বসে ভাবলেই বড় মনে পড়ে। এই পৃথিবীর একটা spiritual nature আছে, আমরা এর গাছপালা, ফুলফল, আলোছায়া, আকাশ বাতাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেচি বলে, শৈশব থেকে এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ বলে, এর প্রকৃত রূপটী ধরা আমাদের পক্ষে বড় কঠিন হয়ে পড়ে। এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি যে আমাদের দর্শন ও শ্রবণ-গ্রাহ্য বস্তু-সমূহ দ্বারা গঠিত হয়েও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও ঘোর রহস্যময়, এর প্রতি অণু যে অসীম সম্ভাব্যতায় ভরা, মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত এক জটিলতায় আচ্ছন্ন, তা হঠাৎ ধরা পড়ে না। হঠাৎ বোঝা যায় না, কিন্তু কতকগুলি প্রাথমিক জ্ঞানকে ভিত্তি করে অগ্রসর হোলে আপনা-আপনি গভীর চিন্তার মুখে ধরা দেয়। এক্ষেত্রে একটা ভুল গোড়া থেকে অনেকে করেন। সেটা এই যে, পূর্ব্বের জ্ঞান মনের মধ্যে এসে পৌছলে অনেকে জ্ঞানের চোখে পৃথিবীর দিকে চেয়ে বলেন জগৎ মিথ্যা ও মায়াময়।

বেদান্তের পারিভাষিক 'মায়া' ছাড়াও আর একটা লৌকিক বিশ্বাসের 'মায়া' আছে, যেটাকে ইংরাজীতে illusion বলে অনুবাদ করা চলবে। বেদান্তের মায়া illusion নয়, সে একটা দার্শনিক পরিভাষা মাত্র, তার অর্থ স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁরা লৌকিক অর্থে 'মায়া' শব্দটা গ্রহণ করেন ও অর্থগত তত্বটা মনে মনে বিশ্বাস করে হৃষ্ট হয়ে ওঠেন, তাঁরা ভুলে যান মানুষও তো এই অসীম রহস্যভরা সৃষ্টির অন্তর্গত। তাঁর নিজের মধ্যে যে আরও অনেক বেশী সম্ভাব্যতা, অনেক বেশী আধ্যাত্মিকতা, অনেক বেশী

জটিলতা, আরও বেশী রহস্য। নিজেকে দীন বলে 'মায়া' কর্তৃক প্রতারিত দুর্ব্বল জীবযাপন করার মধ্যে যে কোনো সত্য নেই, এটা সাহস করে এঁরা মেনে নিতে পারেন না।

নীরোদদের বাড়ী কাল সন্ধ্যার সময় বসে একটা প্রবন্ধ পড়ছিলুম একখানা ইংরাজী পত্রিকাতে। এই কথাই শুধু মনে হোল আমরা জীবনে একটা এমন জিনিস পেয়েচি, যা আমাদের এক মুহূর্ত্তে সাংসারিক শান্তি-দ্বন্দ্বের ওপরে এক শাশ্বত আনন্দ জীবনের স্তরে উঠিয়ে দিতে পারে—অনন্তমুখী চিন্তার ধারা প্রবাহিত করে দেয়, এক মুহূর্ত্তে সংসারের রং বদ্‌লে দেবার ক্ষমতা রাখে। যখনই জগতের প্রকৃত রূপটার যে অংশটুকু আমরা চোখে দেখতে দেখতে যাই তা সমগ্রতার দিক থেকে আমরা দেখতে পাই, পরিপূর্ণ ভাবে জীবনকে আস্বাদ করবার চেষ্টা করি—ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, আকাশ, নীহারিকা, নক্ষত্র, অমরত্ব, শিল্প, সৌন্দর্য্য, পদার্থতত্ব, ফুলফল, গাছপালা, অপরাহ্ণ, জ্যোৎস্না, ছোট ছেলেমেয়ে, প্রেম—তখনই বুঝি এই বিশ্বের সকল সৃষ্ট পদার্থের সঙ্গে একত্ব অনুভব করা ও চারিধারে আত্মাকে প্রসারিত করে দেওয়াই জীবনের বড় আনন্দ। 'আনন্দ' উপনিষদের পারিভাষিক শব্দ, লঘু অর্থে সংসার চলে এসেচে কিন্তু আনন্দ কথার প্রকৃত অর্থ উচ্চ জীবনানন্দ। "আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি জায়ন্তে" এখানে আনন্দের কোনো বর্ত্তমান প্রচলিত সাধারণ অর্থ নেই।

আজ খুব বেড়ানো হোল। প্রথমে গেলুম বন্ধুর ওখানে। তার মোটরে সে প্রবাসী আফিসে আমায় নামিয়ে দিয়ে গেল। সেখান থেকে গেলুম সায়েন্স্ কলেজে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর ডাঃ রায় এলেন। তিনি সিণ্ডিকেটের মিটিং-এ গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে খানিকটা কথাবার্ত্তার পর দুজনে বেরিয়ে পড়া গেল, একেবারে সোজা সারকুলার রোড্ দিয়ে মোটর হাঁকিয়ে প্রিন্সেপ্ ঘাট। বেশ আকাশের রংটা, ক'দিন বৃষ্টির জ্বালায় অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, আজ আকাশ পরিষ্কার হয়েচে, গঙ্গার ওপারে রামকৃষ্ণপুরে ময়দাকলগুলোর ওপরকার আকাশটা তুঁতে রং-এর, পশ্চিম আকাশে কিন্তু অস্তসূর্য্যের রং ফোটেনি—কেন তা জানি না। ডাঃ রায়ের সঙ্গে বর্ত্তমান কালের তরুণ সাহিত্য সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলোচনা হোল—তাঁর মত ভারী

পাকা ও যুক্তিপূর্ণ। সকালে সকালে ফিরলাম, তিনি আবার রেবাজারের দোকানটা থেকে খাবার কিন্‌লেন। আমায় বল্লেন, মাঝে মাঝে দেখা করবার জন্তে।

জীবনে যদি কাউকে শ্রদ্ধা করি, তবে সে এই ডাঃ পি. সি. রায়কে। সত্যিকার মহাপুরুষ। বহু সৌভাগ্যে তবে দর্শনলাভ ঘটে, একথা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। অধিকক্ষণ কথাবার্ত্তা কইবার পরে মনে হয় যে সত্যিই কিছু নিয়ে ফিরচি।

আজ প্রবাসীতে গিয়ে *বইটার প্রথম ফর্ম্মাটা ছাপা হয়েচে দেখে এলুম। সে হিসাবে আমার সাহিত্য-জীবনের আজ একটা স্মরণীয় দিন। ওটা ওদের ওখানে কাল শনিবারে পড়া হবে। ডাঃ কালিদাস নাগ ও সুনীতিবাবু কাল থাকবেন বলেচেন।

সেখান থেকে গেলুম দক্ষিণাবাবুর গৃহ-প্রবেশের নিমন্ত্রণে কালিঘাটে। সুরেশানন্দের ছোট একবছরের খোকাটী কি সুন্দর হয়েচে! ওকে কোলে নিয়ে চাঁদ দেখালুম—ভারী তৃপ্তি হোল তাতে। এরা সব কোথা থেকে আসে? কোন্ মহান্ আর্টিষ্টের সৃষ্টি এরা? অনন্ত আকাশে কালপুরুষের জ্যোতির্ম্ময় অনল জলতে দেখেচি, পূর্ব্ব দিক্‌পালের আগুন অক্ষরে সঙ্কেত দেখেচি, কিন্তু সে রুদ্র বিরাটতার পিছনে এই সব সুকুমার শিল্প কোথায় লুকানো থাকে? কি হাসি দেখ্‌লুম ওর মুখে! কি তুল্‌তুলে গাল!...

একটা উপমা মনে আস্‌চে। আমাদের দেশের বারোয়ারীর আসরে কে যেন রবিবাবুর মুক্তধারা থেকে 'নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র' ওই গানটী আবৃত্তি করচেন। ওর ধ্বনির সঙ্গে ভাবের অপূর্ব্ব যোগ, ওর মধ্যে যে অদ্ভুত ক্ষমতা ও চাতুর্য্য প্রমাণ পেয়েচে, তা কে বুঝ্‌চে? কিন্তু হয়তো এক কোণে এক নিরীহ ব্রাহ্মণপণ্ডিত বসে আছেন—আসর-ভরা দোকানদার দলের মধ্যে তিনিই একমাত্র নীরব রসগ্রাহী, কবির ক্ষমতা বুঝ্‌চেন তিনি। চোখ তাঁর জলে ভাস্‌চে, বুক দুলে উঠ্‌চে।

বিশ্ব-সৃষ্টির এই অসীম চাতুর্য্য, এই বিরাট শিল্প-কৌশল, এই ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্য্য—ক'জন বুঝ্‌বে? দোকানদার দলের মত হাততালি দিচ্চে হয়তো সবাই। কিন্তু কে মন দিয়েচে ওদিকে—কে ভাব্‌চে এই অপূর্ব্ব, অবাচ্য,

* পথের পাঁচালী

অভাবনীয়, অদ্ভুত সৃষ্টির কথা!...মানুষের অভিধানে যাকে বর্ণনা করবার শব্দ নেই।

এক-আধজন এখানে ওখানে। Sir Oliver Lodge, Flammarion, Jeans, Swinburne, রবীন্দ্রনাথ, এঁদের নাম করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় "এদের ফাৎনাতে ঠোক্‌রাচ্ছে"।

আনন্দ! আনন্দ!

"আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি সর্ব্বানি ভূতানি জায়ন্তে"

কাল প্রবাসীতে 'পথের পাঁচালী'র কয়েকটী অধ্যায় পড়া হোল। ডাঃ কালিদাস নাগ ও সুনীতিবাবু উপস্থিত ছিলেন, আরও অনেকে ছিলেন। সকলেই ভারী উপভোগ কর্ল্লেন, এইটাই আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। এ বইখানার আর্ট অনেকেই ঠিক বুঝ্‌তে না পেরে ভুল করেন, দেখে ভারী আনন্দ হোল সজনীবাবু কাল কিন্তু ঠিক আর্টের ধারাটা আমার বুঝে ফেলেচে।

আর্টকে বুদ্ধির চেয়ে হৃদয় দিয়ে বুঝ্‌তে চেষ্টা কর্ল্লে বোঝা যায় বেশী।

এবার বাড়ী গিয়ে গত শনিবারে অনেকদিন পরে কি আনন্দই পেলুম। মটর লতা, কাঠবেড়ালী, নাটাফুল—বর্ষাসরস লতাপাতার ভরা সুগন্ধ। কাল প্রবাসী থেকে গিরীনবাবুর বাড়ী, সেখান থেকে বিন্‌ সাহেবের কাছে অনেকদিন পরে। বেশ দিনটী কাট্‌লো। বিভূতির সঙ্গেও দেখা।

আজ সকালে উঠে অনেকদিন পরে ইসমাইলপুরের সেই কীর্ত্তনের গানটা মনে পড়ল "...যাত্‌ রহি" শেষ দুটো কথা ছাড়া আর আমার কিছু মনে নাই, অথচ গানের ভাবটা আমি জানি। ভারী আনন্দ হোল আজ মনে। শুধুই মনে হচ্ছিল জীবনটাকে আমরা ঠিক চোখে অনেক সময় দেখ্‌তে শিখিনে বলেই যত গোল বাঁধে। জীবন আত্মার একটা বিচিত্র, অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা। এর আস্বাদ শুধু এর অনুভূতিতে। সেই অনুভূতি যতই বিচিত্র হবে, জীবন সেখানে ততই সম্পূর্ণ, ততই সার্থক।

সেইদিক থেকে দেখ্‌লে দুঃখ জীবনের বড় সম্পদ, দৈন্য বড় সম্পদ, শোক, দারিদ্র্য, ব্যর্থতা বড় সম্পদ, মহৎ সম্পদ। যে জীবন শুধু ধনে মানে সার্থকতায়,

আকলো, সুখে-সম্পদে ভরা, শুধুই যেখানে না চাইতে পাওয়া, শুধুই চারিধারে প্রাচুর্য্যের, বিলাসের মেলা—যে জীবনে অশ্রুকে জানে না, অপমানকে জানে না, আশাহত ব্যর্থতাকে জানে না, যে জীবনে শেষরাত্রের জ্যোৎস্নায় বহুদিন-হারা মেয়ের মুখ ভাব্‌বার সৌভাগ্য নেই, শিশুপুত্র দুধ খেতে চাইলে পিটুলি গোলা খাইয়ে প্রবঞ্চনা কর্ত্তে হয়নি, সে জীবন মরুভূমি। সে সুখ-সম্পদ ধনসম্পদ ভরা ভয়ানক জীবনকে আমরা যেন ভয় কর্ত্তে শিখি।

এক-এক সময় মনটা এমন একটা স্তরে নেমে আসে, যখন জীবনের আসল দিকটা বড় চোখে পড়ে যায়; আজ অনেকদিন পরে একটা সেই ধরণের শুভদিন। কল্‌কাতার শহরে এ দিন আসে না।

আজ একটী স্মরণীয় দিন, এই হিসাবে যে আমার বইখানার আজ শেষ ফর্ম্মাটী ছাপা হোল। আজ মাসখানেক ধরে বইখানা নিয়ে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেচি—কত ভাবনা, কত রাত-জাগা, সংশোধনের ও পরিবর্ত্তনের ও প্রুফ দেখার যে ব্যগ্র আগ্রহ, সবারই আজ পরিসমাপ্তি। এইমাত্র প্রবাসী আফিসে বসে শেষ প্যারাটার প্রুফ্ দেখে দিয়ে এলুম। ঠিক ছুমাস লাগ্‌লো ছাপ্‌তে।

ঘনবর্ষার দিনটী আজ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দূরে চেয়ে কত কথা মনে পড়ে। কিন্তু সে-সব কথা এখানে আর তুল্‌বো না।

শুধুই মনে হয় সেই ভাগলপুরে নিমগাছের দিকের ঘরটাতে বসে বনাত-মোড়া সেই টেবিলটাতে সেই সব লেখা—সেই কার্ত্তিক, সাবোর ষ্টেশনে গাছের তলায় শীতকালে পাতা জ্বালিয়ে আগুন-পোহানো, গঙ্গার ধারের বাড়ীটার ছাদে কত স্তব্ধ অন্ধকার রজনীর চিন্তাশ্রম, সেই কাশবনে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে সে-সব ছবি—সবারই আজ পরিসমাপ্তি ঘটল।

উঃ, গত ছ'মাস কি খাটুনিটাই গিয়েচে! জীবনে কখনও বোধহয় আমি এ-রকম পরিশ্রম করিনি—কখনও না। ভোর ছ'টা থেকে এক কলমে এক টেবিলে বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত কাটিয়েচি। মাথা ঘুরে উঠেচে, তখন একটু ট্রামে হয়তো বেড়াতে বেরিয়েচি, ইডেন গার্ডেনে কেয়াঝোপে বসে ও একদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে লালফুল ফোটা ঝিলটার ধারে বসে কত সংশোধনের ভাবনাই ভেবেচি। তার ওপর কাল গিয়েচে সকলের চেয়ে খাটুনি। সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্য্যন্ত বইএর শেষ ফর্ম্মার প্রুফ ও

কাটকুটি, শেষে রাত্রে পাথুরেঘাটার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া ও তদারক করে লোক খাইয়ে বেড়ানো। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, গা হাত-পা যেন কামড়াচ্চে।

যাক্। বই বেরুবে বুধবারে। ভগবান বল্‌তে পারবেন না যে ফাঁকি দিয়েচি, তা যে দিইনি, তিনি অন্ততঃ সেটা জানেন। লোকের ভাল লাগ্‌বে কিনা জানিনা, আমার কাজ আমি করেচি। (ওপরের সব কথাগুলো লিখ্‌লুম আমার পুরোনো কলমটা দিয়ে,—যেটা দিয়ে বইখানার শুরু হতে লেখা। শেষদিকটাতে পার্কার ফাউণ্টেন পেন কিনে নতুনের মোহে একে অনাদর করেছিলুম, ওর অভিমান আজ থাকৃতে দিলুম না)।

আজ বই বেরুল। এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম আজ তাদের সাফল্যকে লাভ করেচে দেখে আমি আনন্দিত। প্রবাসী আফিসে বসে এই কথাই কেবল মনে উঠ্‌ছিল যে আজ মহালয়া, পিতৃতর্পণের দিনটা, কিন্তু আমি তিলতুলসী তর্পণে বিশ্বাসবান্ নই—বাবা রেখে গিয়েছিলেন তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবার জন্যে, তাই যদি কর্ত্তে পারি, তার চেয়ে সত্যতার কোনো তর্পণের খবর আমার জানা নেই।

আজ এই নির্জ্জন, নীরব রাত্রিতে বহুদূরবর্ত্তী আমার সেই পোড়ো ভিটার দিকে চেয়ে এই কথা মনে হোল যে তার প্রতি সন্ধ্যা, প্রতি বৈকাল, প্রতি জ্যোৎস্না-মাখা রাত্রি, তার ফুল, ফল, আলো, ছায়া, বন, নদী—বিশ বৎসর পূর্ব্বের সে অতীত জীবনের কত হাসি কান্না ব্যথা বেদনা, কত অপূর্ব্ব জীবনোল্লাসের স্মৃতি আমার মনকে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। আমার সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টার মূলে তাদেরই প্রেরণা, তাদেরই সুর।

আজ বিশ বৎসরের দূরজীবনের পার হ'তে আমি আমার সে পাখী-ডাকা, তেলাকুচা-ফুল-ফোটা, ছায়াভরা মাটীর ভিটাকে অভিনন্দন করে এই কথাটী শুধু জানাতে চাই—

ভুলি নি। ভুলি নি। যেখানেই থাকি ভুলিনি···তোমারই কথা লিখে রেখে যাবো—সুদীর্ঘ অনাগত দিনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সুরসংযোগের মধ্যে তোমার মেঠো একতারার উদার, অনাহত ঝঙ্কারটুকু যেন অক্ষুন্ন থাকে।

আরও অভিনন্দন পাঠাই সেই সব লোকদের—যাদের বেদনার রঙে আমার বই রঙীন্ হয়েচে—কত স্থানে, কত অবস্থার মধ্যে তাদের সঙ্গে

পরিচয়। কেউ বেঁচে আছে, কেউ বা হয়তো আজ নেই—এদের সকলের দুঃখ, সকলের ব্যর্থতা, বেদনা আমাকে প্রেরণা দিয়েচে—কারুর সঙ্গে দেখা দিনে, কারুর সঙ্গে রাত্রে,—মাঠে বা নদীর ধারে, সুখে কিংবা দুঃখে। এরা আজ কোথায় আছে জানিনে। কোথায় পাবো ঝালকাটির সেই ভিখারীকে, কোথায় পাবো আজ হিরুকাকাকে, কোথায় পাবো কামিনী বুড়ীকে—কিন্তু এই নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার-ভরা শান্তির মধ্য দিয়ে আমি সকলকেই—আমার অভিনন্দন পাঠিয়ে দিচ্ছি।

যারা হয়তো আমার ছাপা-বই দেখ্‌লে খুশি হোত তারাও অনেকে আজ বেঁচে নেই—তাতে দুঃখিত নই, কারণ গতিকে বন্ধ করার মূলে কোনো স্বার্থকতা নেই তা জানি—তাদের গমনপথ মঙ্গলময় হোক্, তাদের কথাও আমার মন থেকে মুছে যায়নি আজ রাত্রে।

আজই সকালে দেশ থেকে এলুম। কাল বৈকালে গিয়েছিলুম ব্যারাকপুরে। সইমার বড় অসুখ। ষষ্ঠীর হাট বাজার, জেলি গোপাল নগর থেকে নিয়ে এল ঘি, ময়দা। নগেন খুড়ো সপরিবারে ওখানেই।

কি সুন্দর বৈকাল দেখ্‌লুম! সে আনন্দের কথা আর জানাতে পারিনে—ঝোপে ঝোপে নীল অপরাজিতা, সুগন্ধ নাটা কাঁটার ফুল, লেজঝোলা হলুদডানা পাখীটা—অস্তসূর্য্যের রাঙা আভা, নীল আকাশ, মুক্তির আনন্দ, কল্পনা, খুশি।

আজ এখন সুটকেশ গোছাচ্ছি। এই মাত্র আমি ও উপেনবাবু টিকিট করে এলুল, আজ রাত্রের ট্রেণে যাবো দেওঘর। কাল আবার সপ্তমী। ওখান থেকে হাজারিবাগ যাবার ইচ্ছে আছে, দেখি কি হয়।

সেই "রাতের ঘুম ফেল্‌নু মুছে" গানটা মনে পড়ে। সেই অশ্বিনী বাবুর বোর্ডিং-এ, ১৯১৮ সালে। আজ শ্যামাচরণদাদাদের 'মাধবী কঙ্কণ" বইখানা এনেচি। সেই কতকাল আগেকার সৌন্দর্য্য, সেই পূজোর পর বাবার সঙ্গে ম্যালেরিয়া নিয়ে প্রথম বাড়ী যাওয়া,—সেই দিদিমা।

সে সব অপূর্ব্ব স্বপ্ন-ভরা দিনগুলি!' জীবনটা যে কি অদ্ভুত, অপূর্ব্ব—তা যারা না ভেবে দেখে তারা কি করে বুঝ্‌বে!...কি করে তারা বুঝ্‌বে কি মহৎ দান এটা ভগবানের!

সকালে আমরা মোটরে করে বা'র হলুম—আমি, উপেনবাবু, অমরবাবু, করুণাবাবু। ঝরণার কি সুমিষ্ট জল।...একটু একটু বৃষ্টি হোল। কিন্তু পথের দুধারে কি অপূর্ব্ব গাছপালা, লতাপাতা, শালচারা, ঝরণা বাঁশবন—দুধারের ঘন জঙ্গলে জংলা মেয়েরা কাঠ কাটচে—কি সুন্দর মেঘের ছায়া—ত্রিকূটের দু-এক স্থান থেকে নীচের দৃশ্য বড় মনোরম। একস্থানে বাঁশের ছায়ায় বসে ডায়েরী রাখ্‌লুম। বড় সুন্দর দৃশ্য!

অর্দ্ধেকটা উঠে বড় পরিশ্রম হোল বলে—সকলে উপরে উঠ্‌তে চাইলেন না। "আয় কুহকিনী নীলে—কে তোমারে আবরিল।" দিব্য শালবনের ছায়ায় বসে—ডায়েরী রাখ্‌লুম। আবার মনে পড়ে—বাড়ীর কথা।

আজ বিজয়া দশমী। আকাশও বেশ পরিষ্কার। সকালের দিকে আমরা সকলে মোটরে বা'র হয়ে প্রথমে গেলুম পূর্ণবাবুর বাড়ী। সেখানে আজ ওবেলা কীর্ত্তন হবে, পূর্ণবাবু আস্‌বার নিমন্ত্রণ করলেন। সেখান থেকে বিমানবাবুর বাড়ী। আমি ও করুণাবাবু মোটরে বসে রইলুম—অমরবাবু ও উপেনবাবু নেমে গেলেন। সেখান থেকে কর্ণীবাদে ফকিরবাবুর ওখানে যাওয়া গেল। একটু দূরে মাটির মধ্যে তপোবনের পাহাড়টা চোখে পড়্‌ল। কালকার বালানন্দ স্বামীর আশ্রমটাও পাশেই পড়্‌লো দেখলুম। আজ কিন্তু সেখানে লোকের ভীড় ছিল না—কতকগুলি এদেশী স্ত্রীলোক রঙ্গিন কাপড় পরে দাঁড়িয়েছিল দেখ্‌লুম। সেখান থেকে করুণাবাবুর বাড়ী হয়ে এক ব্যারিষ্টারের বাড়ীতে অমরবাবুর কি কাজ ছিল তা সেরে যাওয়া গেল দুর্গামণ্ডপে ঠাকুর দেখ্‌তে। দুর্গাপ্রতিমা ভারী সুন্দর করেচে—অমন সুন্দর প্রতিমার মুখ অনেকদিন দেখি নাই। তারপরে বাঙ্গালীদের পূজা-মণ্ডপে এসে খানিকক্ষণ থাকতেই তারা খেতে বল্লে। কিন্তু আমি তখনও স্নান করি নাই। কাজেই আমার হোল না।

বৈকালে নন্দন পাহাড়ে বেড়াতে গেলুম। এত সুন্দর স্থান আমি খুব বেশী দেখি নাই, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাবে। পাহাড়ের উপর গাছপালা বেশী নাই, বন্য আতাগাছই বেশী। কিন্তু পিছনে ধূসর ত্রিকূট পাহাড়ের দৃশ্য ও সম্মুখে অস্তরাগ-রক্ত আকাশের তলে ডিগ্‌রিয়া পাহাড়ের শান্ত মূর্ত্তি বাস্তবিকই মনে এক অদ্ভুত ভাব আনে। দূরে দূরে শাল মহুয়া বন, শুধু উঁচু নীচু ভূমি ও বড় বড় পাথর এখানে ওখানে পড়ে আছে।

অনেকে পাহাড়ের ওপর বেড়াতে এসেচেন। এক সুন্দর হাওয়া,—এক্ষেত্রে মনে হোল বাল্যকালে মডেল ভগিনী বইয়ে এই নন্দন পাহাড়ের হাওয়ার কথা পড়েছিলুম—চারিধারে বনতুলসীর জঙ্গলের মধ্যে বসে ডিগ্রিয়া পাহাড়ের আড়ালে অস্তমান সূর্য্যের দিকে চোখ রেখে কত কথাই মনে আসছিল। উপেনবাবু ও দ্বিজেনবাবুর অবিশ্রান্ত বক্তৃনির দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না।

হঠাৎ মনে হোল আজ আমাদের গ্রামেও বিজয়া দশমী। সারা বাংলাতে আজ এসময়টীতে কত নদীতে কত বাচ্ খেলার উৎসব, কত হাসিমুখ। আমাদের গ্রামের বাঁওড়ের ধারেও এতক্ষণ বিজয়ার আড়ং চল্‌চে—এতক্ষণ বাদা ময়রা তেলে ভাজা জিলিপি বিক্রী করচে—সবাই নতুন কাপড় পরে সেজে এসে বাঁওড়ের ধারে দাঁড়িয়ে আছে ঠাকুর দেখ্‌বার জন্যে। ছেলেবেলার মত বাঁওড়ে বাচ্ হচ্চে। মনে পড়ে অত্যন্ত শৈশবের সেই শালুক ফুল তোলা, তারপরে বড় হয়ে এক দিনের সেই বন্ধুর হাতে চার পয়সা ও মুড়কির কাহিনীটা।

ফিরে আস্‌তে আস্‌তে মনে হোল এতক্ষণ আমাদের দেশে পথে পথে নদীর ধারে প্রিয় পাড়াগাঁয়ের সুপরিচিত ভাঁট্-শেওড়ার বনে অপরাহ্নের ছায়া ঘনিয়ে এসেচে, সেই কটুতিক্ত অপূর্ব্ব সুঘ্রাণ উঠেছে—সেই পাখীর ডাক—এখানকার মত দূরপ্রসারী উচ্চাবচ পাথুরে জমি ও শাল মহুয়া পলাশের বন সেখানে নেই, এরকম পাহাড় নেই স্বীকার করি, কিন্তু সে-সব অপূর্ব্ব মধুর আরামই বা এখানে কোথায়? মনে পড়ে বহুকাল পূর্ব্বে এই সময়েই শৈশবের সে "মাধবী কঙ্কণ" ও "জীবন প্রভাত"—সেই পাকাটীর আঁটি ও দিছরে-পুকুর। বইখানা সেদিন শ্যামাচরণদাদার কাছে চেয়ে নিয়ে এলুম। সে-সব দিনের অপূর্ব্ব মধুর স্মৃতি—সারাজীবন অদৃশ্য ধূপবাসের মত ঘিরেই রইল। এই নিয়েই তো জীবন—এই চিন্তাতে, এই স্মৃতিতে, এই যোগে। এই মনন ও ধ্যান ভিন্ন উচ্চ জীবনানন্দ লাভ করবার কোনো উপায় নেই। এ আমার জীবনের পরীক্ষিত সত্য।

নন্দন পাহাড় থেকে ফিরে এসে দেখলুম অমরবাবুর বাংলোতে বিজয়ার সম্মিলনী বসেচে। গোল চাতালটাতে জ্যোৎস্নার আলোতে চেয়ার পেতে বিমানবাবু, রবিবাবু, অমরবাবু, করুণাবাবু সবাই বসে আছেন। বিজয়ার আলিঙ্গন ও কুশলাদির আদান-প্রদানের পরে চা ও খাবার খাওয়া হোল।

ট্রেনে বান্ধ হয়ে এখানে এসে সন্ধ্যায় পৌছানো গেল। ঠিক সন্ধ্যায় গঙ্গার পুলটা পার হবার সময় এই শান্ত হেমন্ত-সন্ধ্যার সঙ্গে কত কথা জড়ানো আছে, যেন মনে পড়ে। সেই হুগলী ঘোলঘাট ষ্টেশন, সেই কেওটা, সেই হালিসহর, সেই হুগলী—বহুদূরের বাড়ীর সে শান্ত অপরাহ্ন। যেখানে পথের ধারে শ্যামাচরণদাদারা কাঠ কাটিয়েচে, শৈশবের মত সেই কাঠের গুঁড়োগুলো এখনও পথের ধারে যেন রয়েচে—ওসব ভাবলে এক অপূর্ব্ব, বিচিত্র আনন্দে মন পরিপূর্ণ হয়। জীবনের সেই মধুর প্রভাত দিনগুলোর কথা মনে হয়। কাল দিদিমা গল্প করছিল, কবে নাকি সেই জাহ্নবী স্নানে কেওটা গিয়েছিলেন; বাবা সকালে মুখ ধুচ্ছিলেন আমি পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলুম। বুড়ী ঠিক মনে করে রেখেচে। সেই দিনটী থেকে জীবন আরম্ভ হয় না?…

এসেই ওদের বাড়ী গেলুম জগদ্ধাত্রী পূজার নিমন্ত্রণে। বিভূতি, ঘণ্টু খুব খেলা কর্ল্লে। সেখান থেকে এই ফিরচি।

ভারী ঘটনাবহুল দিনটা। ভোরে উঠে প্রথমে গেলুম হেঁটে ইডেন্ গার্ডেনে। শিশিরসিক্ত ঘাসের ধারে ধারে বেড়াতে বেড়াতে খালের জলের রক্ত-মৃণালগুলি দেখছিলুম। ছুটী রাঙা ফ্রক্ পরা ফিরিঙ্গি-বালিকা ফুল তুলে বেড়াচ্ছিল। কেয়াঝোপে খানিকটা বসে বসে *"আলোক-সারথি"র ছক্ কাট্‌লুম। পরে দু'খানা বায়োস্কোপের টিকিট কিনে বাড়ী ফিরবার পথে রমাপ্রসন্নের ওখান হয়ে এলুম।

বৈকালে প্রথম গেলুম প্রবাসী আফিসে। কেদরবাবু মোটরে ঢুক্‌চেন, গেটের কাছে নমস্কার বিনিময় হোল। সজনীর ঘরে গিয়ে দেখি ডাঃ সুশীল দে বসে আছেন। একটু পরে নীহারবাবুও এলেন। খুব খানিক গল্প-গুজবের পর তিনজনে গেলুম সজনীর বাড়ী। উষাদেবী চলে গিয়েচেন। আমার বইখানি গিয়েচেন নিয়ে।

সেখানে "বাঁশি বাজে ফুল বনে" গানটা শুন্‌লুম না বটে, একটা জৌনপুরী টোড়ী রেকর্ডে শুন্‌লাম। চা-পানের পরে ডাঃ দে বাড়ী চলে গেলেন; আমরা তিনজনে গেলুম বায়োস্কোপে। পরে বার বার চেয়ে দেখ্‌ছিলুম—আজ পূর্ণিমা, মাণিকতলা স্পারের পিছন থেকে পূর্ণচন্দ্র উঠচে। বহুদূরের আমাদের বাড়ীটাতে নারিকেল গাছটার পিছন থেকে চাঁদটা ওই রকম

* পরে 'অপরাজিত' নামে প্রকাশিত।

উঠচে হয়ত। সেই সময়টা সেই "আমার অপূর্ব্ব ভ্রমণ", "রাজপুত জীবন সন্ধ্যা"—সেকি অপূর্ব্ব শৈশবের আনন্দ উৎসাহ,—কি অপূর্ব্ব বিচিত্র জীবনটা তাই শুধু ভাবি।

Sunrise film-টা মন্দ নয়। হিন্দুস্থান রেস্তোর াঁয় খেতে গিয়ে গিরিজা বাবুর সঙ্গে দেখা, নমস্কার বিনিময় ও আলাপ হোল। —বাবু B. P. C. C. থেকে returned হয়েচেন শুনলুম, মনটা একটু দমে গেল। বায়োস্কোপ দেখে ফেরবার পথে দীনেশ দাসের সঙ্গে দেখা। প্রবাসী আফিসে মাণিকবাবু জানালে, কেদারবাবু মঙ্গলবারে লেখা চান। আবার প্রবাসীতে যাবার আগে বিচিত্রা আফিসে উপেনবাবু ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তিনিও খুব শীঘ্র লেখা চান। Sub Editor-এর declaration-টা শীঘ্র দিতে হবে তিনি জানালেন।

তারপর বায়োস্কোপ থেকে গেলুম বিভূতিদের বাড়ী। নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে দেখি বৈঠকখানাতে বায়োস্কোপ হচ্চে। বিভূতি বসতে বল্লে। তারপর দেবেন ও হীরুদের সঙ্গে খেতে বসা গেল। অনেকদিন পরে আজ আবার সেই রাসপূর্ণিমা।

বেরিয়ে অনেকদিন আগের মত একখানা রিক্শা করে জ্যোৎস্নায় ও ছাতিম ফুলের গন্ধের মধ্য দিয়ে বাসায় ফিরলুম। সেই ১৯২৩ সাল ও এই। এই ছয় বৎসরে কত পরিবর্ত্তন।

কে জানত উপরে ডায়েরীটা লিখবার সময় যে এই দিনটাতেই রাস-পূর্ণিমার বায়োস্কোপের আসরেই ওদের বাড়ীর সিদ্ধেশ্বরবাবুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা!

বাসায় এসে বারান্দায় রেলিং ধরে জ্যোৎস্না-ভরা আকাশটার দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছিল—যেন এক গ্রহদেব এই অনন্ত জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে হু হু করে উড়ে চলেচেন ওপরে—ওপরে—সজোরে—সবেগে—পায়ের নীচে পুরাতন পরিচিত পৃথিবীটা রইল পড়ে—।

বহুদূর আকাশে যেখানে পরমাণু তৈরী হচ্চে, উল্কারা ছুটচে, ছায়াপথ ছড়িয়ে আছে, নক্ষত্র ছুটচে—সেখানে।

বঙ্কুর জ্বর হয়েচে—আজ দাদাকে পত্র দিয়েচি। দাদা যেতে বলেচেন, তা কি করে হয়! সেদিন বঙ্কুর অত্যাচারের কথা কত শুনলুম। তার স্ত্রী, বোন্ ও শাশুড়ীঠাকরুণ বল্লেন। শুনে দুঃখ হয়, কিন্তু উপায় কি!

জ্যোৎস্নারাত্রে আমাদের বাড়ীটা বহুদূরে কেমন দাঁড়িয়ে আছে, কাঠ

কাটা হয়েচে, আমাদের বাড়ীর সামনে ছেলেবেলাকার মত পথের ওপর তার দাগ রয়েচে। শ্যামাচরণদাদাদের কাঠ।

সে এক জীবন!

কি বিচিত্র, কি অদ্ভুত, কি অপূর্ব্ব এই জীবন-ধারা! একে ভোগ কর্ত্তে হবে।

এই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নায় ইসমাইলপুরের জন্যে মন উদাস হয়ে যায়। যেন তার বিশাল চরভূমি, কালো জঙ্গল, নির্জ্জন বাংলোঘাড়ি—আমায় ডাক দিচ্চে।

কাল স্কুলে ছ'টায় ম্যানেজিং কমিটির মিটিং, এদিকে আবার তিনটার সময় ডাঃ দের ওখানে চা-পানের নিমন্ত্রণ।

আজ দুপুরে মনে পড়ছিল বোর্ডিং-এ থাকতে Traveller's return গল্পটা কি অপূর্ব্ব emotion নিয়েই পড়তুম। বাল্যের সে-সব অপূর্ব্ব emotion মনে পড়লেই মনে হয় কি অপূর্ব্ব, এক বিচিত্র এ জীবন-ধারা! সেদিনের সন্ধ্যায় নন্দরাম সেনের গলিতে যাওয়া, সেই চাউলের গুদাম—সেই শুভঙ্করী পাঠশালার সামনে আমার সহপাঠীর বাড়ী মনে পড়ে।

কি সুন্দর!

এসবের জন্যে কাকে ধন্যবাদ দেবো?—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?

আজ মনের মধ্যে যে তীব্র creative আনন্দ অনুভব করলুম, কলকাতায় এসে পর্য্যন্ত একবছরের মধ্যে তা হয় নি কোনো দিন।

আজ সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ কি হোল আমার, অকারণে আনন্দে মনের পাত্র উপছে পড়চে, একে যেন ধরে রাখা যাচ্ছে না।

মন যেন কি বলে বুঝতে পারি নে। কত কথা মনে হোল।...সারা জীবনের আনন্দ ও সৌন্দর্য্য আজ আমার মনে ভিড় করচে...স্মরণীয় দিন, অতি স্মরণীয় দিন, এরকম কিন্তু খুব বেশী দিন আসে না।...

ইনষ্টিট্যুটে সেই মহিলা-পর্য্যটকের কথা পড়ছিলুম—তুষারবর্ষী শীতের রাত্রে উত্তরমেরু প্রদেশের বরফ-জমা নদী ও অন্ধকার অরণ্যভূমির মধ্যে তিনি তাঁবু ফেলে রাত্রে বিশ্রাম করতেন, দূরে মেরুপ্রদেশীয় Northern Lights জ্বলে, একা তিনি তাঁবুতে—"amidst a waste of frozen river, and dark forests" —সেকানকার নৈশ নীরবতা...নির্জ্জনতা...গভীর শান্তি, মাথার উপর হলুদ রং-এর চাঁদ, অবাস্তব, অন্য গ্রহের জ্যোতিষ্কের মত দেখায়...নৈশ আকাশে অগণ্য নক্ষত্র...আশে-পাশে শুভ্রতুষারাবৃত পাইন অরণ্যের আড়ালে লোলুপ নেকড়ের দল—আর ভাবতে পারা যায় না, মনকে বড় মুগ্ধ, অভিভূত করে।

সন্ধ্যাবেলা এসে চেয়ারটাতে বসে চুপ করে ভাব্‌তে ভাব্‌তে মনে পড়ল এই সব শীতের রাত্রে ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ীর পেছনের ঘন বনে শিয়াল ডাকতো গভীর রাত্রে···সেই বিপদের ভয়, অজানার মোহ, গ্রাম্য জীবনের সৌন্দর্য্য···অদ্ভুত, অপূর্ব···।

আরও মনে পড়্‌লো ইস্‌মাইলপুরের জ্যোৎস্নারাত্রির সে অপার্থিব, weird beauty···সেই এক পূর্ণিমা-রাত্রির শুভ্র জ্যোৎস্নায় ঢেউয়ের নীচে আকন্দ গাছ···স্বপ্নে যেন দেখি···

সেই কুমারদের বাড়ী ঢাক ঘোরাচ্ছে দাসু···পঞ্চাননতলায় কালীপূজো···

ভগবান, কি অসীম বিচিত্রতা দিয়ে এই জীবন, আমার শুধু নয়, সকলের জীবন গড়ে তুল্‌চো—তা কে ছাখে? কে বোঝে?

ধন্যবাদ, অগণিত ধন্যবাদ···হে সৌন্দর্য্যস্রষ্টা মহাশিল্পী, তোমাকে অন্তরের প্রেম কি বলে জানাবো, ভাষা খুঁজে পাই না···

এ তো শুধু পৃথিবীর সুখদুঃখের কথা লিখ্‌চি—তবুও তো আজ নাক্ষত্রিক শূন্যের কথা ভাবি নি, অন্য অন্য জগতের কথা তুলি নি। অন্য গ্রহ-উপগ্রহের কথা ওঠাই নি···

দূর-দূরান্তেরের কথা তুলি নি···

নতুন বৎসরের প্রথম দিনটাতে এবার মোটরে করে শ্রীনগর গেলুম। চাল্‌কী থেকে খুকীকে তুলে নিলুম, পরে গোপালনগরের বাজারে বন্ধুর ড্রাইভার গৌরকে হরিবোলা ঠিক করে দিলে। ড্রাইভারটা প্রথমটাতে মেঠো পথে যেতে চায় না। অবশেষে অনেক করে রাজী করানো গেল। সিমল্যাতে গিয়ে কালাকে ডাক্‌তে পাঠানো গেল, সে নাকি ভাত রাঁধ্‌চে। একটি ছোট মেয়ে জল নিয়ে এল বাল্‌তীতে করে। খাবার খেয়ে নিয়ে আমরা আবার হলুম রওনা। শ্রীনগরের বনের মাথায় মটর ফুলের মত একরকম ফুল অজস্র ফুটে আছে, এত চমৎকার লাগ্‌ছিল! আসবার সময় ডাইনে পশ্চিম আকাশে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল—আকাশের কি চমৎকার রংটা যে!

রাত আটটার সময় পৌছে গেলুম কল্‌কাতা, ঠিক চারটার সময় সিমূলে থেকে ছেড়ে। এ যেন কেমন অদ্ভুত লাগে। Sense of space মানুষের ক্রমেই কেমন পরিবর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছে।···এক শত বৎসর পূর্ব্বে যা কিনা পাকা তিন দিনের পথ, গরুর গাড়ীতে চার দিনের পথ ছিল! কে জানে

আমাদের পৌত্র বা প্রপৌত্রদের Sense of space আরও কত পরিবর্ত্তিত হবে!—

আজ অনেকক্ষণ কার্জ্জন পার্কে একা একা বেড়ালুম। পশ্চিম আকাশে সূর্য্যটা অস্ত যাচ্ছিল,—আমার শুধু মনে যুগ, যুগের কল্পনা জাগে। ঐ নক্ষত্রটা যে ওইখানে উঠেচে, ওতেও কত অপূর্ব্ব জীবনলীলা…। মৃত্যু, বিরহ এসব যদি জীবনে না থাকতো তবে জীবনটা একঘেয়ে, বিচিত্র্যহীন হয়ে পড়তো—হারাবার শঙ্কা না থাকলে প্রেম, স্নেহও হয়তো গভীর ও মধুর হতে পেত না। তাই যেন মনে হয় কোন্ সুনিপুণ শিল্পস্রষ্টা এর এমন সুন্দর ব্যবস্থা করেচেন যেন অতি তুচ্ছ, দরিদ্র লোকেরও জীবনের এ গভীর অনুভূতির দিকটা বাদ না যায়। এ জীবনের অবদানকে খুব কম লোকেই বুঝলে—কেউ এ সম্বন্ধে চিন্তা করে না—সকলেই দৈনন্দিন আহার চিন্তায় ব্যস্ত। কে ভাবে জন্ম নিয়ে, মৃত্যু নিয়ে, আকাশ, ঈশ্বর, প্রেম, অনুভূতি—এসব নিয়ে কার মাথাব্যথা পড়েচে?

ছুটু ও নায়েব ও সন্তোষবাবুর সঙ্গে বেড়াতে গেলুম।—Lief Ericsson was space-hungry. So am I.

জানি না কেন আজ ক'দিন থেকে মনটা কেবলই মুক্তির জন্য ছটফট্ করচে। কি ভাবের মুক্তি? আমাকে কি কেউ শিকলে বেঁধে রেখেচে? —তা নয়। কিন্তু কলকাতার এই নিতান্ত মিনমিনে, একঘেয়ে, ঘরোয়া জীবন-যাত্রা, আজ পনেরো বৎসর ধরে যে জীবনের সঙ্গে আমি সুপরিচিত,—সেই বহু-বারদৃষ্ট, গতানুগতিক, একরঙা ছবির মতো বৈচিত্র্যহীন জীবন-যাত্রা আর আমার ভাল লাগে না।

আজ দুপুরবেলা স্কুলের অবসর ঘণ্টায় চুপি চুপি এসে বাইরের ছাদটাতে বসেছিলুম। আকাশ ঘন নীল, কোথাও এতটুকু মেঘ নেই কোনোদিকে—কেবল একটা চিল বহুদূরে একটা কৃষ্ণ-বিন্দুর মত আকাশের গা বেয়ে উড়ে যাচ্চে—সেদিকে চোখ রেখে ভাবতে ভাবতে আমার মন কোথায় যে উড়ে গেল কি অপূর্ব্ব প্রসারিত করে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা যে মনে জাগল—সে-সব কথা কি লিখে বলা যায়? মনের সে উচ্চ আনন্দের বর্ণনা দেওয়ার উপযুক্ত ভাষা এখনও তৈরী হয় নি। কিন্তু কেন সে আনন্দটা এল, তাও বুঝতে পারি—সেটা এল শুধু জগতের বড় বড় মরু, বিশাল অরণ্যভূমি, দিক্‌দিশাহীন সমুদ্র, মাঠ ও বনঝোপ, মুক্ত প্রকৃতির অপূর্ব্ব মুক্ত রূপের কল্পনায়।

বুঝতে পারি মনটা এরই জন্যে হাঁপাচ্ছে। প্রকাণ্ড কোনো মাঠের ধারে বন, বনের প্রান্তে একটী বাংলো—কিংবা জঙ্গলে ঘেরা [illegible]নি, বালি-মিশ্রিত পাথুরে মাটির গায়ে অভ্রকণা চিক্-চিক্ করচে, নয় তো উঁচু-নীচু পাহাড়ে জমি, যেদিকে চোখ যায় শুধুই বন—এই রকম স্থানেই যেতে চাই—থাক্‌তে চাই। এতটুকু স্থান চায় না মন। চায় আরও অনেক বড় জায়গা—অনেকখানি বড়—অচেনা, অজানা, রুক্ষ, কর্কশ ভূমিশ্রী হোলেও তাই চাইবো, এ একঘেয়ে পোষমানা সৌখীনতার চেয়ে।

সন্ধ্যাবেলা যে ছবিটা দেখ্‌তে গেলুম গ্লোবে, সেটাও আমার আজকের মনের ভাবের সঙ্গে এমন চমৎকার খাপ খেয়ে গেল,—'Liof the Viking' গ্রীনল্যাণ্ড ছেড়ে আরও দূরে, অচেনা দেশ খুঁজে বা'র কর্ত্তে অজানা পশ্চিম মহাসমুদ্রের বুকে পাড়ি জমিয়ে চলে গেল—নিস্তব্ধ রাত্রে জ্যোৎস্না-ঝরা আকাশ-তলায় সদ্য-ফোটা মর্ণ্ডমী ফুলগুলোর দিকে চোখ রেখে এইমাত্র গোলদীঘির ধারে বসে সেই কথাই আমি ভাব্‌ছিলুম।···

ভাব্‌তে ভাব্‌তে মনে হোল আমি যেন এই জগতের কেউ নই—আমি যেন বহুদূর কোন্ নাক্ষত্রিক শূন্য পারের অজানা জগত থেকে কয়েক দণ্ডের কৌতূহলী অতিথির মত পৃথিবীর বুকে এসেচি—ও মর্ণ্ডমী ফুল আমি চিনেও চিনি না, প্রতিবেশী মানুষদের দেখেও দেখি নি, এ গ্রহের বৈচিত্র্যের সবটাই নিয়েচি কিন্তু এর একঘেয়েমিটা আমার মনে বস্‌তে পারিনি এখনও। তার কারণ আমার গতি—স্বর্গীয় গতির পবিত্রতা।

মনে হোল যেন এইমাত্র ইচ্ছা মত পৃথিবীটা ছেড়ে উড়ে আলোকের পাখায় চলে যাবো ওই বহুদূর ব্যোমের গভীর বুকে, যেখানে চিররাত্রির অন্ধকারের মধ্যে একটা নির্জ্জন সাথীহীন নক্ষত্র মিট্‌মিট্ করে জ্বলচে—ওর চারি পাশে হয় তো আমাদের মত কোন্ এক জগতে অপরূপের বিবর্ত্তনের প্রাণী বাস করে—আমি সেখানে গিয়ে খানিকটা কাটিয়ে আবার হয় তো চলে যাবো কোন্ সুদূর নীহারিকা পার হয়ে আরও কোন্ দূরতর জগতের শ্যামকুঞ্জ বীথিতে!

এই সময়ে মৃত্যুর অপূর্ব্ব রহস্য যা সাধারণ চক্ষুর অন্তরাল থেকে গোপন আছে—তার কথা ভেবে মন আবার অবাক্ হয়ে গেল—সারা দেহ মন কেবল অবশ হয়ে গেল।···

কোন্ বিরাট শিল্প-স্রষ্টার পুণ্য অবদান এ জীবন?···কি অতলস্পর্শ,

মহিমময় রহস্য!...রোমাঞ্চ হয়। মন উদাস হয়ে যায়—যখন বাসায় ফিরলুম, তখন যেন কেমন একটা ঘোর ঘোর ভাব।...

জীবনকে যে চিন্‌তে পেরেছে—এ জগতে তার ঐশ্বর্য্যের তুলনা নেই—তার কল্পনার পঙ্গুতা ও ভাব-দৈন্য দৈনন্দিন ভোগবিলাসের উর্দ্ধে তাকে উঠ্‌তে প্রাণপণে বাধাদান করচে, সে শাশ্বত-ভিক্ষারীর দৈন্য কে দূর করবে?...

আজ অনেককাল পরে—প্রায় বারো বৎসর পরে—শিশিরবাবুর চন্দ্রগুপ্তের অভিনয় দেখে এইমাত্র ফিরচি। সেই ছাত্রজীবনে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে দেখ্‌বার পরে এই আজ দেখা। অভিনয় খুব ভালই হোল, কিন্তু আমি কি জানি কেন মনের মধ্যে প্রথম যৌবনের সে অপূর্ব্ব উন্মাদনা, নবীন, টাট্‌কা, তাজা মনের সে গাঢ় আনন্দানুভূতিটুকু পেলাম না। দেখে দেখে যেন মনের সে নবীনতাটুকু হারিয়ে ফেলেছি।

আজকাল অন্যদিক দিয়ে মনের মধ্যে সব সময়ই একটা অপূর্ব্ব উৎসাহ পাই—একটা অন্য ধরণের উদ্দীপনা। সেটা এত বেশী যে, তা নিয়ে ভাবতেও পারি না—ভাব্‌লে মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

মনে হয় এই যে কল্‌কাতার একঘেয়েমি যাকে বল্‌চি—এও চলে যাবে। সে যাত্রার বাঁশি যেন বেজেচে মনে হচ্চে। বহুদূরে যাত্রা। সমুদ্রের পারে—প্রশান্ত মহাসাগরের পারে।

নানা দার্শনিক চিন্তা মনে আস্‌চে, কিন্তু রাত হয়েচে অনেক—আর কিছু লিখ্‌বো না।

ক'দিন বেশ কাট্‌চে। অনেক দিন পরে ক'দিনের মধ্যে ভোম্বলবাবু, ননী, নানু, প্রসাদ—এরা সব এসেছিল। সেদিন অনেকদিন পরে রাজপুরে চললুম। খুকীর সঙ্গে দেখা হোল, ভারী আদর করলে। তারপর একদিন গড়িয়ায় জলের ধারের মাঠে, আমি ও ভোম্বল বেড়াতেও গেলুম। কত কি গল্প আবার পুরোনো দিনের মতই হোল। একদিন অবশ্য আমি একা গিয়েছিলুম,—পূর্ণিমার দিন।

আজ বসে বসে সেই দিনগুলোর কথা ভাব্‌ছিলুম। যাত্রাদলের ছেলে ফণি বাড়ীতে খেতে এল—বাবা বর্দ্ধমান থেকে এলেন—তারও অনেক আগে যখন

বকুলতলায় প্রথম বারোয়ারীর বেহালা বাজানো শুনে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলুম —সে-সব টাট্‌কা—তাজা, আন্‌কোরা আনন্দ এখনও কিন্তু যেন ভাব্‌লে কিছু কিছু পাই। যেদিন সেই প্রথম বেহালা বেজেছিল, যেদিনটা বাবার সঙ্গে নৈহাটী হয়ে সিঙ্গাড়ার আলু খেয়ে কেওটা থেকে বাড়ী আস্‌ছিলুম— যেদিন চড়ক তৈরী কর্ম্ম—ঠাকুরমাদের বেলতলায় আমি নিজে; ঠাকুরমাদের পোড়ো ঘরে পাঠশালা-করা, কড়ি খেলায় আমোদ, পূবমুখো যাওয়া, মরগাঙে মাছ ধরতে যাওয়া—শনিবারে ছুটীতে বাড়ী আসার আনন্দ —কত লিখবো। কে জীবনের এসব মহনীয় অবদান পরম্পরার কথা লিখ্‌তে পারে? আর মনে হয় আমি ছাড়া এসবের আসল মানে আর কেই বা বুঝ্‌বে? তা তো সম্ভব নয়—অন্য সকলের কাছে এগুলো নিতান্ত মামুলী কথা মনে হবে। এদের পিছনে যে রসভাণ্ডার লুকানো আছে আমি ছাড়া আর কে তা জান্‌বে?…

অনেকদিন পরে দেশে এসে বেশ আনন্দে দিন কাট্‌চে। রোজ সকালে উঠে ইছামতীর ধারের মাঠটাতে বেড়াতে যাই, ঝাড় ঝাড় সোঁদালী ফুল ফুটে থাকে, এত পাখী ডাকে!…চোখ গেল, বৌ-কথা-ক', কোকিল কত কি।…বেড়িয়ে এসে ওপাড়ার ঘাটে স্নান কর্তে নামি। ওপারের চরের শিমূলগাছটার মাথায় তরুণ সূর্য্য ওঠে, দু'পারে কত শ্যামল গাছপালা। সোঁদালী ফুলের ঝাড় মাঝে মাঝে দুল্‌তে দেখ্‌লেই আমার মনে কেমন অপূর্ব্ব আনন্দ ভরে ওঠে!…প্রভাতে পাখীরা যে কত সুরে ডাকে, জলের মধ্যে মাছের ঝাঁক খেলা করে।—জীবনের প্রাচুর্য্যে, সরসতায়, সৃষ্টির মহিমায় অভিভূত হয়ে যাই। কতদূরের সব জীবনধারার কথা, জগতের কথা মনে হয়—আবার স্নান করতে করতে চেয়ে দেখি নদীর ধারে গোছা গোছা ঘাস হেলাগোছা ভাবে জলের মধ্যে মাথা দোলাচ্ছে একটা হয়তো খেজুর গাছ গাঙ্গিতলার বাঁকে অন্য সব গাছপালার থেকে মাথা উঠিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অপূর্ব্ব, সুন্দর, হে স্রষ্টা, হে মহিমময়, নমস্কার, নমস্কার। অন্য সব জগৎও যে দেখ্‌তে ইচ্ছে যায়, দেখিও।

রোজ বৈকালে কালবৈশাখীর ঝড় ওঠে, মেঘ হয়, রোজ, রোজ। ঠিক তিনটা বেলা বাজ্‌তে না বাজ্‌তে মেঘ উঠ্‌বে, ঝড়ও উঠ্‌বে। আর সমস্ত আম বাগানের তলাগুলো ধাবমান, কৌতুকপর, চীৎকাররত বালকবালিকাতে

ভরে যায়—*সলতে-খাগীতলা, তেঁতুলতলা, শ্যামাচরণদাদাদের বাগানটা, নেকো, পটুলে, বাঁশতলী—সমস্ত বাগানে যাতায়াতের ধুম পড়ে গিয়েচে—।

সেদিন ঘনমেঘের ছায়ায় জেলে পাড়ার সবাই—স্ত্রী-পুরুষ-বৃদ্ধ-বালকেরা ধামা হাতে আম কুড়ুচ্চে দেখে আমার চোখে জল এল। জীবনে ওই এদের কত আনন্দের, কত সার্থকতার জিনিস।···একটা ছেলে বল্‌চে—ভাই—ওই দোম্‌কাটায় মুই যদি না আস্‌তাম, তবে এত আম পেতাম না!···

কাল সাতবেড়ে মেয়ে দেখতে যাবো।···

সারা গ্রামটাতে বিল্বগাছের ফুলের কি ঘন সুগন্ধ!···অশ্বত্থ তলায়, যেখানে সেখানে এত বেলের গাছও আমাদের এখানে আছে!

কাল সাতবেড়ে গ্রামে গিয়ে একটু বেড়িয়ে এলাম। শশী বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের বাড়ী খুব আহার হোল। গ্রামখানিতে সবই চাষা লোকের বাস, ভদ্রলোকের বাস তত নেই, তবে সকলেরই অবস্থা সচ্ছল। মাটীর-ঘরগুলো সেকেলে ধরণের, কোনো নতুন আলো এখনও ঢোকে না বলে সেখানের অকৃত্রিম আবহাওয়াটা এখনও আছে। ফণি কাকা ও আমি দু'জনে দক্ষিণ মাঠের দায়েমের পুকুরের ধার দিয়ে বেশ ছায়ায় ছায়ায় বৈকালের দিকে চলে এলাম। নফর কামারের কলাবাগানে কামারবুড়ী কি ফলমূল ও কাঁকুড় নিয়ে আস্‌চে দেখ্‌লাম। হরিপদ দাদার স্ত্রী বাগানে আম পাড়াচ্ছেন।

আজকাল রোজ বৈকালেই মেঘ ও ঝড়বৃষ্টি হওয়ার দরুণ কুঠীর মাঠে একদিনও বেড়াতে যাওয়া হয় না। রোজই কালবৈশাখী লেগে আছে। সুন্দর বৈকাল একদিনও পেলাম না। তিনটা বাজ্‌তে না বাজ্‌তেই রোজ জল আর ঝড়।

আজও সকালে নদীতে স্নান করে এলুম। কি সুন্দর যে মনে হয় সকালে স্নানটা করা, স্নিগ্ধ নদীজল, পাখীর কলকাকলী, মাছের খেলা, নতশীর্ষ গাছপালা, নবোদিত সূর্য্যদেব।

আজ বেড়াতে গেলুম বৈকালে কাঁচিকাটার পুলটাতে। সকালে অনেকক্ষণ চেয়ার পেতে ওদের বেলতলাটায় বসেছিলুম, সেখানে কেবল আড্ডাই হোল। বেলা যখন বেশ পড়ে এসেচে তখন গেলাম ঠাকুরমাদের বেলতলাটায়, ঝিবুচি একজন লোক জটেমারীর কুঠী খুঁজ্‌চে, আমাদের বাড়ীর পাঁচীলের

* 'পথের পাঁচালী'তে এই আমগাছটির উল্লেখ আছে।

কাছে। তারপর নিজে গেলাম বেলডাঙ্গার পুলটায়। একখানা যেন ছবি, যখন প্রথম অশ্বত্থতলার পথটা থেকে ওপারের দৃশ্যটা দেখলাম—এ রকম অপূর্ব্ব গ্রাম্যদৃশ্য কচিৎ চোখে পড়ে। বেলেডাঙ্গা গ্রামের বাঁশবনের সারি নদীর হাওয়ায় মাথা দোলাচ্চে, কৃষক-বধূরা জল নিতে নামচে বাঁওড়ের ঘাটে। দু'পারে সবুজ আউশের ক্ষেত, মজুরেরা ঠোঙ্গা মাথায় ক্ষেতে ক্ষেতে ছাটার কাজ করচে, ছোট ডোঙ্গা চেপে কেউবা মাছ ধরতে বেরিয়েচে—যেন ওস্তাদ শিল্পীর আঁকা এক অপূর্ব্ব ভূমিচিত্রীর ছবি।

একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাথায় মোট নিয়ে পাঁচপোতা থেকে ফিরচে—গোঁসাই বাড়ীর কাছে বাসা করেচে বললে—নাম বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায়। দেখে ভারী কষ্ট হোল—একা ভাগ্যহীন, অসহায় মানুষ। বল্লে, শীতলা ঠাকুর নিয়ে গ্রামে গ্রামে বেড়াই—যে যা দেয়, তাতেই চলে। বাড়ীতে এক ছোট ছেলে আছে ও দুটী মেয়ে।

বসে বসে অনেকক্ষণ হাওয়া খেলুম, সঙ্গে সঙ্গে কত দেশের জীবনধারার কথা, বিশেষ করে যারা দুঃখ পেয়েচে তাদের কথাগুলো বড় বেশী করে মনে হোল। ভারতের মা দিন-রাত দুঃখ কর্চ্চেন, তাঁর দুঃখ শুনে সত্যি মনে কষ্ট হয়। কষ্ট হয় এই ভেবে জগতের এত আনন্দ-ধারার এক কণাও এরা পাচ্চে না—হয়তো শুধু দেখবার চোখ নেই বলেই।

ফিরবার পথটী আজ এত ভাল লাগল, ওরকম কোনো দিন লাগে না—ডাঁশা খেজুর ও নোনা ডালে ডালে দুলচে—এত পাখীর গানও এদেশে আছে!…কুঠীর মাঠটা যে কি সুন্দর দেখতে হয়েচে—ইতস্ততঃ প্রবর্দ্ধমান গাছপালা, বনঝোপের সৌন্দর্য্যে বিশেষ করে যেখানে সেখানে, যেদিকে চোখ যায়—ফুলে-ভরা সোঁদালী দোলায়িত। আকাশের রংটা হয়েচে অদ্ভুত —অপূর্ব্ব নির্জ্জনতা শুধু পাখীদের কল-কাকলীতে ভগ্ন হচ্চে—কেউ কোনো দিকে নেই—ধূসর আকাশতলে গভীর শান্ত ও ছায়ার মধ্যে কেবল আমিও মুক্ত, উদার প্রকৃতি।

কি অপূর্ব্ব আনন্দেই মন ভরে যায়, কত কথাই মনে ওঠে, সাধ্য কি কলকাতায় থাকলে এ সব কথা মনে উঠতে পারে!…

তারপর ওপাড়ার ঘাটটীতে স্নিগ্ধ জলে স্নান করতে নেমে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। শ্যামল, ধূসর বৃক্ষশ্রেণী, স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, স্বচ্ছ নদীজল—মাথার ওপরে সন্ধ্যার প্রথম নক্ষত্রটী উঠেচে, সেদিকে চেয়েকত শত নক্ষত্রমণ্ডলী, বিভিন্নমুখী

নক্ষত্রস্রোত, অন্ত অন্ত নীহারিকাদের জগতের কথা মনে হোল। বৃহৎ এণ্ড্রোমিডা নীহারিকাদের জগৎ। এই সামান্য, ক্ষুদ্র গ্রহটাতে যদি অস্তিত্বের এত বৈচিত্র্য, এত সরসতা, এত সৌন্দর্য্য—তবে না জানি সে-সব বিশ্বে কি অপরূপ আনন্দস্রোত!...

সব দুঃখের একটা সুস্পষ্ট অর্থ হয়। জীবনের একটা মহান্, বিরাট অর্থ, একটা সুস্পষ্ট রূপ মনের চোখে ফুটে ওঠে। নির্জ্জন স্থান ভিন্ন, পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তন ভিন্ন,—এ আনন্দ কি সম্ভব?...

সন্ধ্যার পরে আমি, সইমা, ন'দি অনেকক্ষণ গল্পগুজব করা গেল। আজকার রাতটা কালকার মত গরম নয়, শেষ রাত্রে মেঘ করার দরুণ বেশ ঠাণ্ডা। সারারাত লণ্ঠন ধরে ধরে লোকেরা ও ছেলের দল আমাদের বাড়ীর পিছনের ঘন জঙ্গলের ওপারের বাগানগুলোতে আম কুড়িয়েচে, সারা রাতটা।

কি সুন্দর বৈকালটা কাল কাটলো যে! কুঠীর মাঠে অনেকক্ষণ বসে পরে নদীজলে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে স্নান করতে নামা গেল। এত অপূর্ব্ব ভাব এল মনে, ঠাণ্ডা নদীজল, ছিপি-শেওলার পাতার ধারে দাঁড়িয়ে, ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যায় আকাশ ও শ্যামল গাছগুলার দিকে চোখ রেখে শুধু এদের পিছনে যে বিরাট অবর্ণনীয় শক্তি জাগ্রত আছে, তার কথাই বার বার মনে আস্‌ছিল। স্বচ্ছ জলের ভেতরে মাছের দল খেলা করচে—একটা ছোট মাছ তিড়িং করে লাফিয়ে শেওলার দামের গায়ে পড়্‌ল। নদী জলের আর্দ্র, সুগন্ধ উঠ্‌চে—ওপারে মাধবপুরের পটলের ক্ষেতে তখনও চাষারা নিড়েন দিচ্চে—বাদাম গাছের মাথায় একটা নক্ষত্র উঠেচে। সারাদিনের গুমটের পর শরীর কি স্নিগ্ধই হোল!...

শেষ রাত্রে বেজায় গুমট গরমে আইঢাই করচি এমন সময় হঠাৎ ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি এল। ন'দি, জেলি, বুড়ী-পিসিমা, জেলে পাড়ার ছেলেরা অমনি আম কুড়ুতে ছুটলো। ঘন অন্ধকারের মধ্যে লণ্ঠন জেলে সব ছুট্‌ল চাটুয্যে বাগানের দিকে। জেলির মা চেঁচিয়ে পিছু ডাকাতে জেলি আবার এল ফিরে।

সকালটার সিঁদুরে মেঘে অপরূপ শোভা হয়েছিল। পরশু বৈকালটাতে এই রকমই সিঁদুরে-মেঘ করেছিল—আমি সেটা উপভোগ করতে পারিনি, গোপালনগরের হাটে গিয়েছিলাম।

আজ প্রায় বাইশ বছর পরে ভাণ্ডারকোলায় নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলুম। কিন্তু কাল সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বেলেডাঙার মাঠে যে অদ্ভুত মনের রূপ ও প্রকৃতির রূপ দেখেছিলাম, অমন কখনো দেখিনি। কাঁচিকাটার স্কুল থেকে ফিরবার পথে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে বুড়োর পত্রটা পকেট থেকে পড়্‌চি—প্রমীলা মারা গিয়েচে লিখ্‌চে। সামনে অপূর্ব্ব রং-এর আকাশটা ঘন হীরাকসের সমুদ্রের মত গাঢ় ময়ূরকণ্ঠী রং-এর পিছনে বর্ণ-সমুদ্র, কোথাও জনমানব নেই—গাছে গাছে পাখীর ডাক, দূরে গ্রামসীমায় পাপিয়া সুর উঠিয়েচে,—জীবনের অপূর্ব্বতা কি চমৎকার ভাবেই সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন আকাশটার দিকে চেয়ে মনে হোল!

কাল বৈকালের দিকে বেলেডাঙার বট-অশ্বত্থের পথটা বেয়ে বেড়াবো বলে, কুঠীর মাঠের পথটা দিয়ে চললুম সেদিকে—মাঠে পড়েই অবাক্ হয়ে পশ্চিম আকাশে চেয়ে রইলুম—মুগ্ধ আত্মহারা হয়ে গেলুম। সারা বেলেডাঙার বনশ্রেণীর ওপর ঘন কালো কালবৈশাখীর ঝোড়ো মেঘ জমেচে—অনেকটা আকাশ জুড়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকার মেঘচ্ছটা—আর তার ছায়ায় চারি ধারের বাঁশবন, ঘন সবুজ শিমুল ও বটগাছগুলা, নীচে আউশের ক্ষেত, বাঁওড়—সবটা জড়িয়ে সে এক অপরূপ মূর্ত্তি ধরেচে। বিশেষ করে ছবি দেখ্‌তে মারাত্মক রকমের সুন্দর হয়েচে এক শিমুল ডালের—তার সোজা মগ্‌ডালটা মেঘের ছায়ায় ও উড়নশীল ঘন কালো-মেঘে ঢাকা আকাশের পটভূমিতে কোন্ দেবশিল্পীর আঁকা মহনীয় ছবির মত অপূর্ব্ব। সেইটি দেখে চোখ আর আমার ফেরে না—কেমন যেন পা আট্‌কে গেল মাটীর সঙ্গে, অবশ হয়ে গেলুম, মুগ্ধ হয়ে গেলুম, দিশাহারা হয়ে পড়্‌লুম—ওঃ!—সে দৃশ্যটার অদ্ভুত সৌন্দর্য্যের কথা মনে এলে এখন সারা গা কেমন করে ওঠে।

তারপরই সাঁ-সাঁ রবে ওপরের দিক থেকে বিরাট ঝড় উঠ্‌লো—দৌড়, দৌড়, দৌড়,—হাঁপাতে হাঁপাতে যখন গেঁয়োখালী আমতলাটায় পৌঁছিয়েচি—আমাদের গ্রামের কোলে—তখন বৃষ্টি পড়্‌তে শুরু করেচে—জেলি আর প্রিয় জেলের ছেলে আম কুড়্‌চ্চে—একটি দরিদ্র যুবককে আগ্রহ সহকারে আম কুড়্‌তে দেখে চোখে জল এল। কি দিয়েচে জীবন এদের? অথচ এরা মহৎ, এদের দারিদ্র্যে এরা মহৎ হয়েচে। অতিরিক্ত ভোগে ও স্বাচ্ছল্যে জীবনের সরল ও বন্ধুর পথটাকে হারায় নি।

স্নান সেরে এসে বকুলতলার ছায়ায় বসে ওপরের কথাগুলো লিখ্‌লাম। মাথার ওপর কেমন পাখীরা ডাকচে—ফিঙে, দোয়েল, চোখ-গেল—আর একটা কি পাখী—পিড়িং পিড়িং করে ডাক্‌চে, কত কি অস্ফুট কল-কাকলী—কি ভালই লাগে এদের বুলি!...

আজ বৈকালে হাট থেকে এসে কুঠীর মাঠে গিয়ে অনেকক্ষণ বস্‌লুম। শিমুলগাছের এত অপরূপ শোভা তা ত' জান্‌তাম না। ঝোপের মাথায় মাথায় কি নতুন কচি লতা সাপের মত খাড়া হয়ে আছে। মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল সৌন্দর্য্যের ভারে—চারিধারে চেয়ে—এই প্রকৃতির সঙ্গে, পাখীর গানের সঙ্গে মানুষের সুখ-দুঃখের যোগ আছে বলেই এত ভাল লাগে। গ্রামপ্রান্তের সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন-বেণুবনশীর্ষের দিকে চেয়ে মনে হোল ওদের সঙ্গে কত দিনের কত স্মৃতি যে জড়িত—সেই বর্ষার রাতে দিদির কথা, মায়ের কত দুঃখ, আহুরী ডাইনীর ব্যর্থতা, পিসিমা, ইন্দির ঠাকরুণের,—কত সমুদ্রে যাওয়ার স্মৃতি—সেই পিটুলিগোলা-পানকারী দরিদ্র বালকের, পল্লীবালা জোয়ানের কতকাল আগের সে-সব ইংরাজ বালক-বালিকার, গাং-চিল পাখীর ডিম সংগ্রহ করতে গিয়ে যারা বিপন্ন হয়েছিল—Cape Wan-এর ওদিকে গিয়ে যারা আর ফেরেনি—কত কি, কত কি।

নদীজলও আজ লাগল অদ্ভুত—শান্ত সন্ধ্যা—কেউ নেই ঘাটে, ওপরের গাছপালায় ধূসর সন্ধ্যা নেমেচে—একটি নক্ষত্র উঠেচে মাথার ওপর—কোন্ অনন্ত দেশের বাণীর মত এই শত দৈন্যসংকীর্ণতাময় সংসারের ঊর্দ্ধে জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলচে।

এখানকার বৈকালগুলো কি অপূর্ব্ব! এত জায়গায় তো বেড়িয়েচি, ইসমাইলপুর, ভাগলপুর, আজমাবাদ—কিন্তু এখানকার মত বৈকাল আমি কোথাও দেখচি বলে মনে হয় না—বিশেষ করে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মেঘহীন বৈকালগুলি—যেদিন সূর্য্য অস্ত যাবার পথে মেঘাবৃত না হয়, শেষ রাঙা আলোকটুকু পর্য্যন্ত বড় গাছের মগ্‌ডালে হাল্‌কা সিঁদুরের পোচের মত দেখা যায়—সেদিনের বৈকাল। গাছের ও বাঁশবনের ঘন ছায়ায় চাপা-আলো, ভাসা খেজুর ও বিষপুষ্পের অপূর্ব্ব সুরভি মাখানো, নানা ধরণের পাখী-ডাকা, মিষ্ট সে বৈকালগুলিতে এমন সব অদ্ভুত ভাব মনে এনে দেয়, দু' একটা পাখী ধাপে ধাপে সুর উঠিয়ে কোথায় নিয়ে তোলে—কি উদাস, করুণ হয়ে ওঠে

তখন চারিদিকের ছবিটা, বিশেষ করে আমি যখন আমাদের ভিটে ও ঠাকুরমাদের বেলতলাটায় গিয়ে খানিকক্ষণ বসেছিলাম, তখন—তার আর কোনো বর্ণনা দেওয়া যায় না। আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ, কিন্তু এখনও বিষপুষ্পের গন্ধ সর্বত্র, পাখীর ডাকের তো কথাই নেই—সোঁদালিফুল এখনও আছে, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা যেন কিছু কম। আমাদের বাগানে এখনও আম আছে, আজ সকালে নদী থেকে আস্‌বার পথে লক্ষ্য করে দেখলাম, এখনও লোক তলায় তলায় আম কুড়ুচ্চে।

এ সৌন্দর্য্য ছেড়ে কোথাও নড়্‌তে ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া ভেবে দেখ্‌লাম যত স্থানে বেড়িয়েচি, আনন্দ সবচেয়ে বেশী গাঢ় ও উদারভাবে আমি পাচ্চি শুধু এই এখানে—কোনো Cosmic thoughts আট্‌কায় না, বরং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়—খুব ভাল করে ফোটে। তবে এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মধ্যে দিনরাত ডুবে থাকা যায় বলেই এখানে কোনো শ্রমজনক কাজ করা সম্ভব হয় না দেখ্‌লুম। বিকেল হোতে না হোতে কেবল মন আন্‌চান্ করে—রাত্রিতে কাজে মন বসে না—এ যেন Land of Lotos-eaters কোনো শ্রমসাধ্য কাজ এখানে সম্ভবপর নয়, সেই জন্যই কলকাতা ফিরতে চাচ্চি দু'একদিনের মধ্যে। আজকাল দিনগুলা একেবারে মেঘমুক্ত, রাত্রি জ্যোৎস্নায় ভরা, সকালগুলি স্নিগ্ধ, পাখীর ডাকে ভরপুর, আর বৈকাল তো ওইরকম স্বর্গীয়, অপরূপ, এ পৃথিবীর নয় যেন—তবে আর লিখি কখন ?

মনে মনে তুলনা করে দেখ্‌লুম এধরণের বৈকাল সত্যিই কোথাও দেখিনি—এই তো পাশেই চাল্‌কী, ওখানে এরকম বৈকাল হয় না। এত পাখী সেখানে নেই, এধরণের এত বেলগাছ নেই, সোঁদালি ফুল নেই, বনজঙ্গল বড় বেশী,কাজেই অন্ধকার—এমন চাপা আলোটা হয় না—এ একটা অপূর্ব্ব সৃষ্টি, এতদিন তত লক্ষ্য করিনি, কাল লক্ষ্য করে দেখে মনে হোল সত্যিই তো এ জিনিস আর কোথাও দেখিনি তো! দেখ্‌বোও না—কেবলমাত্র সেখানে দেখা যাবে যেখানকার অবস্থাগুলি এর পক্ষে অনুকূল। ইসমাইল্‌পুর, আজমাবাদ লাগে না এর কাছে—সে অন্য ধরণের—প্রাচুর্য্য, বৈচিত্র্য, ও কারুকার্য্য কম—বিপুলতা বেশী, প্রখরতা বেশী।

ভাগলপুর তো লাগেই না। কতকগুলো বিশেষ ধরণের পাখী, বিশেষ ধরণের বন-বিন্যাস, বিশেষ ধরণের গাছপালা থাকতে এ অঞ্চলেই মাত্র ঠিক এই ধরণের বৈকাল সম্ভব হয়েচে। সোঁদালি ফুল তার মধ্যে একটা বড়

সম্পদ, মাঠে, বনে ওর ঝাড় যখন ফুটে থাকে তখন বনের চেহারা একেবারে বদ্‌লে যায়—বনদেবীর সাজির একটা অযত্নচয়িত বনফুলের গুচ্ছের মত নিঃসঙ্গ মনে হয়—এই নিঃসঙ্গ সৌন্দর্য্য ওকে যে শ্রী ও মহিমা দান করেচে—তা আর কোনো ফুলে দেখ্‌লাম না।

এই সুন্দর দেশে বাস করেও যারা মানসিক কষ্ট পাচ্ছে, আমার সইমার মত—তাদের সে কষ্ট সম্ভব হচ্চে শুধু অজ্ঞানতা কুসংস্কারের জন্য। মনের সাহস এদেশটা হারাতে বসেচে—কল্পনার উদারতা নেই, সুদৃঢ় বিস্তীর্ণতা নেই—দৃষ্টি সেকেলে ও একপেশে, তার ওপর মনের মধ্যে জ্বলেনি জ্ঞানের বাতি। এত করে সইমাকে বোঝাই, সে শিক্ষা সইমা নেয় না, নিতে পারবেও না—কতকগুলো মিথ্যা সংস্কার ও কাশীরাম দাস এবং কৃত্তিবাস ওঝার প্রচলিত কতকগুলা False Philosophy এদেশের অশিক্ষিতা মেয়েদের মনের সর্ব্বনাশ করেচে। জীবনের সহজ দর্শন এদের নেই, বুড়োবয়সেও ভালো করে এখনও চোখ ফোটেনি—কি করা যায় এদের জন্যে, সর্ব্বদাই সে কথা ভাবি। শিক্ষা দ্বারা মানুষ নিজেকে নিজে পায়, এইটাই জীবনের বড় লাভ। ভগবানকে পাবার আগে নিজেকে লাভ করা যে আবশ্যক তা এরা ভুলে গিয়ে শুধু ভগবান্ বলে নাকে কাঁদ্‌তে থাকে, নিতান্ত দুর্ব্বল জড়মতির মত। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য" এ কথা এরা শোনেওনি কোনদিন।

সারা পল্লী অঞ্চলগুলো এমন হয়ে আছে, এদের দুঃখ দূর করতে গেলে তো জঙ্গল কাটালে হবে না, মশা তাড়ালেও হবে না (সেটা যে অনাবশ্যক, তা আমি বল্‌চি না) মাসিক কিছু অর্থ সাহায্যের বন্দোবস্ত করলেও হবে না—এর জন্যে চাই জ্ঞানের আলো—উদার, বিপুল, দীপ্ত জ্ঞানের সার্চ্চ লাইট।

আজ অনেকক্ষণ দাসী পিসিমার সঙ্গে গল্প কর্লুম। সেকালের অনেক কথা হোল। ওই সবই আমার জান্‌বার বড় ইচ্ছে। ঠাকুমাদের চণ্ডীমণ্ডপের ভিটাতে দুর্গোৎসব হোত, বড় উঠোন ছিল—অন্নপিসি দুবেলা গোবর দিতেন, খুব লোকজন খেত—নারিকেল গাছের পাশে ওই যে সুঁড়ি গলিটা ওইটা ছিল খিড়্‌কীর দোর—মেটে পাচীল ছিল ওদিকটা। গোলক চাটুয্যে ছিলেন বাবার মামাতো ভাই—পিসিমার মা ছিলেন ব্রজ চাটুয্যের পিসি। রাখালী পিসিমা ছিলেন চন্দ্র চাটুয্যের মেয়ে। প্রসঙ্গতঃ বলা যাক্ যে আজই রাখালী পিসিমার মারা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গেল। যাবো যাবো করে

আর ঘটে উঠ্‌ল না। পিসিমার শ্বশুরবাড়ী ছিল চৌবেড়ে। নিবারণ মাখালী পিসিমার ভাই, ভারী সুন্দর দেখ্‌তে ছিল—কলেরাতে মারা যায় আঠারো বছর বয়সে। সইমাদের বাড়ীতে আসার ওই পথটাতে প্রকাণ্ড এক বকুল গাছ নাকি ছিল—তার তলায় অনেক লোক বস্‌তো। হরি ঠাকুরদাদা তাঁর মাকে খেতে দিতেন না, মায়ের সঙ্গে ভিন্ন ছিলেন, তাঁর দেওর গোঁসাই বাড়ী ঠাকুর পূজো করে দু' পাঁচ টাকা যা জমাতো, তাই দিয়ে দরিদ্র বৃদ্ধাকে ধান কিনে দিয়ে যেতো।

বৈকালে নলে জেলের নৌকাতে বেড়াতে গেলুম, মোল্লাহাটীর দিকে। ছ'টার সময় আমাদের ঘাট থেকে নৌকাখানা ছাড়া হোল। নদীর দুধারে অপরূপ শোভা, কোথাও বাব্‌লা গাছ ফুলের ভারে নত হয়ে নদীর ধারে ঝুঁকে আছে, দু'ধারে ঘাস-ভরা নির্জ্জন মাঠ, ঝোপে-ঝাড়ে ফুল ফুটে আছে, গাঙ্‌ শালিকের দল কিচ্‌-কিচ্‌ করচে, বাঁ ধারে ক্রমাগত জলের ধারে ধারে নলবন, ওকড়া ও বন্যেবুড়োর গাছ—মাঝে-মাঝে চাষীদের পটোল ক্ষেত, বেলেডাঙার ঘোষেরা যে নতুন ক্ষেতটাতে পটল করেচে, তাতে টোকা মাথায় উত্তুরের মজুরেরা নিড়েন দিচ্চে, ওদিকে কুম্‌ড়োর ক্ষেত—ঢালু সবুজ ঘাসের জমি জলের কিনারা ছুঁয়ে আছে, গরু চরছে, বাঁকের মোড়ে দূরে খাব্‌রাপোতা গ্রামের বাঁশবন, সুবৃহৎ lyre পক্ষীর পুচ্ছদেশের মত নতুন বাঁশের আগা—একটু একটু রোদ মাখা। নদীজলের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গন্ধ বেরুচ্চে, মাথার ওপরকার আকাশ ঘন নীল, কিন্তু পশ্চিম দিগন্তে গ্রামসীমায় শিমুল, কদম গাছের মাথায় মাথায় অপরূপ মেঘস্তূপ, মেঘের পর্ব্বত—মেঘের গিরিবর্ত্মের ফাঁকটা দিয়ে অস্তসূর্য্যের ওপারের দেশের খানিকটা যেন দেখা যায়।

খানিকটা গিয়ে একধারের পাড় খুব উঁচু, বন্য নিমগাছের সারি, পাড়ের ধারে গাঙ্‌ শালিকের গর্ত্ত, নীল মাছরাঙা পাখী শেওলার ধারে ধারে মাছ খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে একবার ওঠে, একবার বসে—খেজুরগাছ, গাবভেরাণ্ডা, বৈঁচি, ফুলে ভর্ত্তি সাঁই বাব্‌লা, আকন্দের ঝোপ, জলের ধারের নলবন, কাশ, ষাঁড়া, নোনা, গুলঞ্চলতা-দোলানো শিমূল গাছ, শালিক পাখী, খেঁকশিয়ালী, বাঁশঝাড়, উইঢিবি, বনমূলার ঝাড়, বকের দল, উঁচু ডালে চিলের বাসা, উলুঘাস, টোকাপানার দাম। সাম্‌নেই কাঁচিকাটার খেয়াঘাট, দু'খানা ছোট

চালাঘর, জনকতক লোক পারের অপেক্ষায় বসে—ডানধারের আকাশটায় অপূর্ব্ব হীরাকসের রং ধরেচে—গাঢ়, নীল।

আবার দু'পাড় নির্জ্জন, এক এক স্থানে নৌকা তীরের অত্যন্ত নিকট দিয়ে যাচ্চে যে কেলেকোঁড়া ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। বেলা আরও পড়ে এল, চারিদিকে শোভা অপরূপ, লিখে তা প্রকাশ করা যাবে না, ডাইনে ঘন সবুজ ঘাসের মাঠ, বামে আবার উঁচু পাড়, আবার বাব্‌লা গাছ, শিমুলগাছ, ষাঁড়া, গাছ, পাখীর দল শেষ-বেলায় ঝোপে ঝোপে কলরব করচে—দূরে গ্রামের মাথায় মেঘস্তূপটা পেছনে পড়েচে—এক এক স্থানে নদী-জল ঘোর কালো, নিথর কলার পাখীর মত পড়ে আছে—দেখাচ্চে যেন গহন, গভীর, অতল-স্পর্শ। বাঁকটা ঘুরেই অনেকখানি আকাশ এক সঙ্গে দেখা যাচ্চে, পশ্চিম আকাশের কোলে যেন আগুন লেগেচে, অনেকখানি দূর পর্য্যন্ত মেঘে, আকাশে, গাছের মাথায় মাথায় যেন সে আগুনের আভা, খাব্‌রাপোতার ঘাটের পাশে কোন্ দরিদ্র কৃষক-বধূ জলের ধারের কাঁচড়াদাম শাক কোঁচড় ভরে তুল্‌চে আর মাঝে মাঝে সলজ্জভাবে আমাদের নৌকার দিকে চাইচে।

আরও খানিকদূর গেলাম, আবার সেই নির্জ্জনতা, কোথাও লোক নেই, জন নেই, ঘর বাড়ী নেই, শুধু মাথার ওপর সন্ধ্যার ধূসর ছায়াছন্ন আকাশ আর নীচে সেই মাঠ ও গাছপালা দুধারে। বুড়ো ছকু মাঝি ছেলে সঙ্গে নিয়ে দু'খানা ডিঙি দোয়াড়ি বোঝাই দিয়ে চূর্ণী নদীতে মাছ ধর্ত্তে যাচ্চে, তিন দিনে সেখানে নাকি পৌছুবে বল্লে। একদিকে ঘন সবুজ কাঁচা কষাড়ের বন, নীচু পাড়, জলের খানিকটা পর্য্যন্ত দাম-ঘাসে বোঝাই, কলমী শাক অজস্র, আর কলমীর দামে জলপিপি ও পানকৌড়ী বসে আছে। মাথার ওপরকার আকাশটা বেয়ে সবাইপুরের মাঠটার দিক থেকে খুব বড় এক ঝাঁক শামুকুট পাখী বাসায় ফিরুচে, বোধ হয় জটেমারির বিল থেকে ফির্‌লো, পাঁচপোতার বাঁওড়ে যাবে। সেইখানটাতে আবার নলে মাঝি কাস্তে হাতে—ঘাস কাটতে নাম্‌লো—কি অপরূপ শোভা, সাম্‌নে খাব্‌রাপোতার ঘাট্‌টা—একটা শিমূল গাছের পিছনের আকাশে পাট্‌কিলে রং-এর মেঘদ্বীপ, চারি ধারে এক অপূর্ব্ব শ্যামলতা, কি শ্রী, কি শান্তি, কি স্নিগ্ধতা, কি অপূর্ব্ব আনন্দেই মন ভরিয়ে তোলে—নল কাস্তে হাতে ঘাস কাট্‌ছে—কাঁচা কষাড়ের মিষ্ট, সরস, জোলো গন্ধ বার হচ্ছে, আমি শুধু হেলান দিয়ে বসে আকাশটা ও গাছপালার দিকে চেয়ে আছি।

জীবনটাকে উপভোগ করতে জান্‌তে হয়। মাত্র আট আনা খরচ হোল,—তাই কে? তার বদলে আজ বৈকালে যে অপূর্ব্ব সম্পদ পেলাম, তার দাম দেয় কে? আমাদের গ্রামের কেউ আস্‌তো পয়সা খরচ করে খামোকা নৌকায় বেড়াতে? কেউ গ্রাহ্য করে এই অপরূপ বনশোভা, এই অস্তদিগন্তের ইন্দ্রজাল, এই পাখীর দল, এই মোহিনী সন্ধ্যা?...কেউ না। এই যে সৌন্দর্য্যে দিশাহারা হয়ে পড়্‌চি, মুগ্ধ, বিস্মিত, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌চি—এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবে থেকেও এরা কেউ চোখ খুলে চায়?...আমি এসব করি বলে হয়তো আমাকে পাগল ভাবে।

যে জাতির মধ্যে সৌন্দর্য্য-বোধ দিন দিন এত কমে যাচ্ছে, সে জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব সন্দেহ হয়। শহর বাজারের কথা বাদ দিলাম, এই সব পাড়াগাঁয়ে যেখানে আসল জাতিটা বাস করে, সেখানকার এই কুশ্রী জীবন-যাত্রার প্রণালী, দৃষ্টির এই সংকীর্ণতা, এই শিল্পবোধের অভাব মনকে বড় পীড়া দেয়।

এবার জ্যোৎস্না উঠলো—আজ শুক্লা একাদশী, নলবন বাতাসে দুল্‌চে, জ্যোৎস্না পড়ে দু'পাশের নদীজল চিক্‌-চিক্ করচে। ঘাসের আটী বেঁধে নিয়ে নলে মাঝি নৌকা ছেড়ে দিল।

এত পাখী, গাছপালা, নীল আকাশ, এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এ সব যেন আমারই জন্যে সৃষ্ট হয়েচে। এদেশেই তো এসব ছিল এতদিন, কেউ তো দেখেনি, কেউ তো ভোগ করেনি—কতকাল পরে আমি এদের বুঝলাম, এদের থেকে গভীর আনন্দ পেলাম, এদের রসধারা পান করে তৃপ্ত হলাম—এই জ্যোৎস্না, এই আকাশ, এই অপূর্ব্ব ইছামতী নদী আমারই জন্য তৈরী হয়েচে!

অনেক দিন পরে আমাদের ঘাটে দুপুরে স্নান করতে গিয়েছিলুম। স্নান সেরে এই রৌদ্রদীপ্ত নদী, দূরের ঘুঘু-ডাকা বনানী, উঞ্চমগুলের এই অপূর্ব্ব বন-সম্পদ, স্বচ্ছ জলের মধ্যে সন্তরণশীল মৎস্যরাজি, নির্ম্মেঘ নীল আকাশ—আমার শিরায় শিরায় কেমন একপ্রকার মাদকতার সৃষ্টি করল।

একটী ছেলের ছবি মনে এল—সে এম্‌নি Tropics-এর শ্যামল সৌন্দর্য্য, রৌদ্রকরোজ্জ্বলা পৃথ্বী, নীল দিক্‌চক্রবালের উদার প্রখরতার মধ্যে এই জলধারা পান করে, দিনরাত গায়ক পাখীদের কাকলী শুনে শৈশবে মানুষ হয়েছিল—

গ্রামের কত দুঃখ-দারিদ্র্য, কত বেদনা, কত আনন্দ, কত আশা, কত ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে। সে মানুষ হয়ে উঠে এদের গান গেয়ে গেল—এই গাছপালা, লতা, পাখী, ফুলফল, সূর্য্য—এদের,—এরাই তাকে কবি করেছিল।

বৈকালে হাট থেকে এসে বইখানা নিয়ে নিজের ভিটেতে গিয়ে খানিকটা পড়ে এলুম—তারপর গেলুম জটামারির পুলটাতে। ঝির্‌ঝিরে বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল! তারপর এক বড় অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হোল, এমন এক অপূর্ব্ব আনন্দে মন ভরে উঠ্‌ল, সারা গা এমন শিউরে উঠ্‌ল—সে পুলকের, সে উল্লাসের তুলনা হয় না—গত কয়েক মাসের কেন, সারা বৎসরের মধ্যে ওরকম আনন্দ পাইনি।

আজ চলে যাবো তাই বিদায় নিলুম—বিদায় জ্যাঠামশায়ের পোড়ো ভিটে, বিদায় আমার গ্রাম, বিদায় ইছামতী, আবার তোমাদের সঙ্গে কবে দেখা হবে জানি না, আর দেখা হবে কিনা তাও জানি না, কিন্তু তোমার ফলে জলে পুষ্ট হয়েছিল তোমার অপরূপ সৌন্দর্য্যে এমন স্বপ্নঅঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছিলে দশ বৎসরের বালকের চোখে, তোমার গাছপালার ছায়াতলে, তোমার পাখীর কল-কাকলীতে জীবন-নাট্যের অঙ্ক শুরু, বিদায়, বিদায় যেখানে থাকি তোমাদের কথা কি কখনো ভুল্‌বো?…

মনে হয় যুগে যুগে এই জন্মমৃত্যুচক্র কোনো এক বড় দেব-শিল্পীর হাতে আবর্ত্তিত হচ্চে, হয়তো দু'হাজার বছর আগে জন্মেছিলাম ঈজিপ্টে, যেখানে নলখাগড়ার বনে, শ্যামল নীল (Nile) নদের রৌদ্রদীপ্ত তটে কোন্ দরিদ্র ঘরের মা, বোন্, বাপ, ভাই, বন্ধুবান্ধবদের দলে এক অপূর্ব্ব শৈশব কেটেচে, তারপর এতকাল পরে আবার যাটটি বছরের জন্যে এসেচি এখানে—আবার অন্য মা, অন্য বাপ, অন্য ভাই বোন্, অন্য বন্ধুজন। পাঁচ হাজার বছর পরে আবার কোথায় চলে যাবো কে জানে? এই Cycle of Birth and Death যিনি নিয়ন্ত্রিত করচেন আমি তাঁকে কল্পনা করে নিয়েচি—তিনি এক বড় শিল্পী। এই সকল জন্মের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা হয়তো কোন দূর জীবনের উন্নততর, বৃহত্তর, বিস্তৃততর অবস্থায় সব মনে পড়্‌বে—সে এক মহনীয়, বিপুল, অতি করুণ অভিজ্ঞতা।

কে জানে যে আবার এ পৃথিবীতেই জন্মাবো। ওই যে নক্ষত্রটা বটগাছের সারির মাথায় সবে উঠেচে—ওর চারি পাশে একটা অদৃশ্য গ্রহ হয়তো

ঘুরচে, তার জগতে যেতে পারি—বহু বছরের Globular cluster-দের জগতে যেতে পারি—কে বল্‌বে এসব শুধুই কল্পনা-বিলাস? এ যে হয় না তা কে জানে? হয়তো নিছক কল্পনা নয় এসব—বৃহত্তর জীবন-চক্র যুগে যুগে কোন্ অদৃশ্য দেবতার হাতে এ ভাবেই আবর্ত্তিত হচ্চে।

শত শত জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে যাঁর চলাচলের পথ—জয় হউক সে দেবতার, তাঁর গতির তেজে সম্মুখের ও পশ্চাতের অমুক্তির অন্ধকার জ্যোতির্ম্ময় হউক, নিত্যসৃষ্টি জায়মান হউক তাঁর প্রাণ-চক্রের নিত্য আবর্ত্তনশীল বিশাল পরিধিতে।

গুন্ গুন্ করে বানিয়ে বানিয়ে গাইলুম, আপনিই মুখে এসে গেল :—

'গভীর আনন্দরূপে দিলে দেখা এ জীবনে

হে অজানা অনন্ত—'

নিজেকে দিয়ে বুঝেচি তুমি কত বড় শিল্পী, নিজের দৃষ্টি দিয়ে বুঝেচি তুমি কত বড় দ্রষ্টা, নিজের সৃষ্টিকে দিয়ে বুঝেচি তুমি কত বড় স্রষ্টা।

হঠাৎ সারা দেহ এক অপূর্ব্ব আনন্দে ভরে উঠ্‌ল—ওপারে মাধবপুরের বটগাছের সারি, বেলেডাঙার গ্রামের বেণুবনশীর্ষ সান্ধ্য বাতাসে দুল্‌চে—আউশধানের ক্ষেতের আইল-পথ বেয়ে কৃষক-বধূ মাটীর কলসী নিয়ে জল ভর্‌তে আস্‌চে, আইনদ্দি মোড়লের বাড়ীর মাথায় শুক্রতারা উঠেচে—মনে হোল আমি দীন নয়, দুঃখী নয়, ক্ষুদ্র নয়, মোহগ্রস্ত জড় মানব নয়, আমি জন্মজন্মান্তরের পথিক—আত্মা। দূর থেকে কোন্ সুদূরে নিত্য নূতন পথহীন পথে আমার গতি—এই বিশাল বিশ্ব, এই বিপুল নীল আকাশ, অগণ্য জ্যোতিলোক, এই সহস্র সহস্র শতাব্দী—আমার পায়ে চলার পথ, নিঃসীম শূন্য বেয়ে সে গতি আমার ও সারা মানবের যুগে যুগে বাধাহীন হোক্।

মনে হোল আর এক আজন্ম পথিক-দেবতার কথা, তাঁর কথা আমার এক খাতায় লিখেচি। আমার সে কল্পনা সত্য কি মিথ্যা সে বিচারের কোনো প্রয়োজন নেই, আমার দৃষ্টিতে আমি তা দেখেচি, আমার কাছে সেটা মহাসত্য—revealation, চিন্তা ও কল্পনার আলোকে যা দেখা যায়—তাকে আমি মিথ্যা বলে ভাব্‌তে পারি না।

বিদায়, বিদায়—আর কখনো অজয়ের সঙ্গে দেখা হোল না, গুরুজীর সঙ্গে দেখা হোল না, কথক ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হোল না, দেবব্রতের সঙ্গে

দেখা হোল না—অনেকদিন পরে অজয়ের সেই শৈশবে-শোনা গানটা যেন কোথায় বসে গাচ্ছে মনে পড়ে।

'চরণ বৈ মধু বিন্দতি' চলা-দ্বারাই অমৃত লাভ হয়, অতএব চলো।

দেশ থেকে এসে আজ একেবারেই ভাল লাগচে না। বৈকালগুলির জন্যে মন কেমন করচে, কুঠীর মাঠের জন্যে, খুকীর জন্যে, ইছামতীর জন্যে, ফণিকাকার জন্যে—সকলের জন্যেই মন কেমন হয়েচে। ছেলেবেলায় দেশ থেকে বোর্ডিং-এ ফিরলে এমনটী হোত, অনেক কাল পরে মানস ইতিহাসে তার পুনরাবৃত্তি দেখা গেল।

কাল কল্‌কাতাটা যেন নতুন নতুন লাগ্‌ছিল—যেন এ কোন্ শহর—এর কর্ম্মব্যস্ত চেহারাতে আমিই কেমন অবাক্ হয়ে গেলাম, আনন্দবাজার পত্রিকার ওই গলিটী, কলেজ ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট সব তাতেই লোকে একটা কিছু করচে—ব্যস্ত, ক্ষিপ্র, ছুটচে, বাস্ থেকে নাম্‌চে—দেশের মানুষদের সে মৃতের মত জড়তা, অলস ও কর্ম্মকুণ্ঠতার পরে এসব যেন নতুন লাগল।

দিনটী কাট্‌ল বেশ ভালোই। সকালে উঠে সজনীর সঙ্গে গেলুম কাঁচরাপাড়া, সেখান থেকে বড়-জাগুলে হয়ে মরিচা। এত ঘন বন যে কল্‌কাতার এত কাছে থাক্‌তে পারে, না দেখলে বিশ্বাস কর্‌বার প্রবৃত্তি হয় না। সেখানে গিয়ে ঔষধ সংগ্রহ করে কাঁচরাপাড়ায় এলাম। বাস্ রিজার্ভ করে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে আসা গেল কাঁচরাপাড়া মাঠের মধ্য দিয়ে মোহিত মজুমদারের কাছে। মোহিতবাবু শোনা গেল শা'গঞ্জ গিয়েছেন। কাঁচরাপাড়া বাজারে একটা দোকানে কিছু খেয়ে নিয়ে বাসে করে এলুম হালিসহর খেয়াঘাটে। এই ঘাটে অনেকদিন আগে দিদিমা থাক্‌তে একবার সর্ব্বপ্রথম কেওটা এসেছিলুম, হালিসহরে থাক্‌তে।

মোহিতবাবুর ওখানে খাওয়া-দাওয়া হোল, অনেকক্ষণ সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ করে বর্ত্তমান তরুণ-সাহিত্য সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হোল। ভদ্রলোক প্রকৃত কবি, সাহিত্যই দেখ্‌লুম ওঁর প্রাণ, কবিতা পড়্‌তে বসে যখন ছেলেমেয়েরা তাঁর কোল থেকে টানাটানি করে রসগোল্লা খেতে লাগ্‌ল—তখন সে কি দৃশ্যই হোল!

বেরিয়ে আমি আর মোহিতবাবু কেওটায় প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালায়

খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে গেলুম। সে জায়গাটা এখন একটা পোড়ো ভিটে ও জঙ্গল—কোণের সে জামরুল গাছটা এখনও আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে জামরুল গাছটা চেনা যাচ্ছিল না—মোহিতবাবু কাছে গিয়ে বল্লেন—হ্যাঁ, এটা জামরুল গাছই বটে। জামরুল পেকে আছে।

তারপর রাখাল চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলুম। পুলিন তাঁর ছেলে। ছেলেবেলায় আমরা এক সঙ্গে বিপিন মাষ্টারের পাঠশালায় পড়েচি—এখন ও হট্‌পা লম্বা, কালো গোঁপ-দাড়িওয়ালা মানুষ। ওর সঙ্গে কথা বল্লুম প্রায় ত্রিশ বছর পরে। শেষ কবে ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম কে জানে?···

রাখাল চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর ভিতরের রোয়াক দিয়ে ওদের রান্নাঘরের রোয়াকে বসে মাসীমার সঙ্গে কথা বল্লুম। শেষ কবে কথা বলেছিলাম, কবে ওদের রোয়াকে পা দিয়েছিলাম, হয়তো তখন আমরা কেওটাতে ছিলাম—তারপর হয়তো শীতলের মায়ের গল্পবলা, কি আতুরীর কাছে ধামা কুলো বেচার ঘটনাটা—যা আমার কেওটা সম্পর্কে মনে আছে, ঘটেছিল। তারপরে এক বিরাট আনন্দ, আলাপ, রহস্য, দুঃখ, হর্ষ, শোক, আলোকপূর্ণ—বিরাট জীবন কেটেচে—পট্‌পটি তলার মেলায়, বকুলতলার দিনগুলাতে, পূব-মুখো যাওয়ায়, ইছামতীর ধারের সে অপূর্ব্ব শৈশবের আনন্দময় দিনগুলি—সেই কতদিন স্কুল থেকে সপ্তাহ পরে ফিরে এসে মায়ের হাতে চৈত্র মাসের দিনে বেলের পানা খাওয়া তারপর স্কুল কলেজ, বাইরের জীবনে যা কিছু ঘটেচে সবই ওর পরে। কালকার দিনটীতে আবার এতকাল পরে পা দিলাম রাখাল চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর ভিতরকার রোয়াকে বা পুলিনের সঙ্গে কথা কইলাম।

জীবনের অপূর্ব্বত্ব এই সব মুহূর্ত্তে কি অদ্ভুত, অপরূপ ভাবেই ধরা পড়ে যায়।

করুণা মামার বাবা যোগীন্‌বাবু জানালা খুলে কথা কইলেন। তিনি আমাকে খুব চেনেন দেখ্‌লাম।

রাত আটটার বাসে হুগ্‌লী ঘাট এলাম। খুব পরিষ্কার আকাশ, খুব নক্ষত্র উঠেচে। রাত এগারোটায় কলকাতা ফেরা গেল।

সেই সকাল ছ'টায় বেরিয়ে কোথায় বঁড় জাগুলে, মরিচা, দু'ধারের ঘন জঙ্গল, কাঁচরাপাড়া বাজার, বাঁশের পুল, হালিসহরের খেয়াঘাট, কেওটা, হুগ্‌লী ঘাট, নৈহাটী—সব বেড়িয়ে ঘুরে আবার কলকাতা ফিরলাম সাড়ে

এগারোটা রাত্রে। মোটর বাস্ ছিল বলেই একদিনে এত ঘোরাঘুরি, এমন সব অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা সম্ভব হোল।

রাখাল চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর পৈঠায় বসে মোহিতবাবু 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। কেওটায় সেই অশ্বথ. গাছটার কাছে রাত আটটার সময় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ সাহিত্য-মণ্ডলী গঠনের ও শনিবারের চিঠি অন্যভাবে বা'র করার জন্য খানিকটা পরামর্শ করা হোল। কাজে কতদূর হয় বলা যায় না।

কাল মোহিতবাবু কলকাতায় এসেচেন, সজনীবাবু লিখে পাঠালেন। বৈকালে গেলাম প্রবাসী আফিসে। সেখান থেকে বা'র হয়ে সকলে মিলে প্রথমে যাওয়া গেল ডাঃ সুশীল দে'র বাড়ী। সেখানে ঢাকার বর্ত্তমান হাঙ্গামা ও ইউনিভার্সিটীর গোলযোগ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হোল। সজনীবাবুর ব্যক্তিগত কথাও অনেক উঠ্‌ল—অনেকক্ষণ বসে সেখানে হাসি-গল্প হোল, বেশ উপভোগ করা গেল—ডাঃ দে আমার ঠিকানা চাইলে বিপদে পড়লুম—এ বাসাটা যদি বদলাই তবে, বদ্‌লে ফেল্লে এ ঠিকানাটা দিয়েই বা লাভ কি?

সেখান থেকে বা'র হয়ে সবাই গেলাম কবি যতীন বাগ্‌চীর বাড়ী। মনোহরপুকুর রোড তো প্রথমে খুঁজেই বার করা দায়। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে বালিগঞ্জ এ্যাভিনিউ বেয়ে আমরা রাত ন'টার সময় একবার এদিক একবার ওদিক—সে মহামুস্কিল। অনেক কষ্টে রাত দশটার সময় বাড়ী বেরুল। যতীনবাবু আমাদের দেখে খুব খুশি হলেন। মোহিতবাবু আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন; বল্লেন, অল্পদিনের মধ্যেই ইনি যশস্বী হয়ে উঠেচেন একখানা বই লিখে, luck আছে বল্‌তে হবে। আমি মনে মনে খুব খুশি হয়ে উঠ্‌লাম, মুখে যাই বলি। তারপর জল-টল খাওয়ার পরে সেখান থেকে অনেক রাত্রে বাসায় ফেরা গেল।

আজও আবার তাই। প্রথমে কেদারবাবুর সঙ্গে এশিয়াটিকদের অকর্ম্মণ্যতা নিয়ে খানিক তর্ক-বিতর্ক হোল। উনি বল্লেন, কেন, জঙ্গিস্ খাঁ কি বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন নি? আমি বল্লুম—সেটা one man show মাত্র, কোনো স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা তিনি করেছিলেন কি? প্রবাসী আফিস থেকে আমরা গেলুম অমল হোমের বাড়ী, সেখানে অনেকক্ষণ গুল্পগুজব ও

কবিতা আবৃত্তি হোল। অমল হোমের স্ত্রী বল্লেন, একটী মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চান, আপনার 'অপরাজিত' পড়ে—আমি তাঁকে ডাকি,—কালোর ঘরেই আছেন।

মেয়রের নির্ব্বাচন সম্পর্কে অনেকগুলো নতুন কথা শুনলাম অমল হোমের মুখে—যতীন সেনগুপ্ত এবার মেয়র না হোলে অনেকে দুঃখিত হবে বটে, কিন্তু মেয়র হোলে লোকে তার চেয়েও দুঃখিত হবে। বাইরে চেয়ে দেখলাম আকাশে মেঘ করেচে—অনেকটা দূরের আকাশও দেখা যায়—দূরের কথা, দেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। এঁরা বেশ শিক্ষিতা মেয়ে, ধরণ-ধারণ এত মার্জ্জিত ও মধুর যে এঁদের সঙ্গে গ্রামের মেয়েদের—সইমা কি বুড়ী পিসিমা এদের তুলনা করে হতাশ হতে হয়। একটা ভাঙ্গা কড়া এক জায়গায় বসানো ছিল, বেরুবার সময় পায়ে এমন লাগ্‌ল!···

সেখান থেকে এলাম সুরেশবাবুর বাড়ী। সেখানে হেম বাগ্‌চী ও সুবল বসে আছে। সুরেশবাবুর স্ত্রী চা-এর উদ্যোগ কর্ত্তে আমরা নিবৃত্ত করলাম—কেননা এইমাত্র অমল হোমের বাড়ী থেকে আমরা চা, পাঁপর ভাজা, বাদাম ভাজা ও রসগোল্লা খেয়ে আস্‌চি। ফরাসী কবি বোদ্‌লেয়ার সম্বন্ধে খানিকটা কথাবার্ত্তা হোল, মোহিতবাবু একটা লেখা পড়্‌লেন—তারপর আমরা সবাই এলাম চলে। মোহিতবাবুর আবৃত্তি কি সুন্দর!

কি সুন্দর সন্ধ্যাটা কাট্‌ল!

আজ সকালে ধূর্জ্জটিবাবু এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ও সুরেশ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে গল্পগুজবের পর আসাম মেলে রাণাঘাট এলাম ও সেখান থেকে সাড়ে তিনটার ট্রেণে দেশে এলাম। হাজারির মোটরটা দাঁড়িয়েছিল, সহজেই বাজার পর্য্যন্ত আসা গেল।

এসেই কাপড়-চোপড় ছেড়ে গামছা নিয়ে নদীতে গা ধোবার জন্য গেলাম। ভারী সুন্দর বৈকাল, আকাশের রং এমন সুন্দর শুধু বর্ষাকালেই হয়। গাছপালার রং কি সবুজ—রৌদ্রের রংটা কেমন একটা অদ্ভুত ধরণের, কুঠীর মাঠে গেলাম—সেই শিমুলগাছটার গায়ে কি সুন্দর রৌদ্রই পড়েচে—চারি ধারে আকাশের রং-এ বড় মুগ্ধ কর্লে।

আমাদের ভিটার পাশে যে গাছটা আছে, তার গায়ে খানিকটা হলদে রং-এর রোদ লেগে দেখ্‌তে হয়েচে অদ্ভুত।

মাঠের চারিধারে সবুজ গাছপালা, আউশ ধানের সবুজ ক্ষেত, সুনীল আকাশ, এখনও বৌ-কথা-ক' ডাকচে—খুব ডাকচে। সোঁদালী ফুল এখনও কিছু কিছু আছে।

কাল বৈকালে প্রথম গেলাম সুবলবাবুদের বাড়ী বাগবাজারে, সেখানে খানিকক্ষণ গল্পগুজবের পরে বিভূতিদের ওখানে গেলাম। বাগবাজার ট্রামে আসবার সময়ে মনে ভাবছিলাম সাতাশ বছর আগে এই বর্ষাকালে, তবে বোধহয় এর আরও কিছু পরে—এই জায়গাটী দিয়ে ট্রামে করে যেতুম বাবার সঙ্গে। তখন আমি নিতান্ত বালক, আর আজ কেবলই মনে হচ্চে এই সময়ের পরে কল্‌কাতা ছেড়ে দেশে গিয়ে সে কি অপূর্ব্ব জীবন-যাত্রা! কি বৈচিত্র্য! সে শুধু অনুভূতিতে ভরা—নানা ধরণের বিচিত্র বাল্য অনুভূতি!···আসল জীবনটাই তো হোল এই অনুভূতি নিয়ে, পুলক নিয়ে, উচ্ছ্বাস নিয়ে। আজও সেই গ্রাম আছে, নদী আছে, কিন্তু সে অপূর্ব্ব অনুভূতি আর নেই।

বিভূতিদের বাড়ী থেকে যখন আসি তখনও কেমন একটা শূন্যতার ভাব, যেন এদের বাড়ীর সকলেই আছে—অথচ কি যেন নেই। সবাই কাছে এল, বস্‌লে, গল্পগুজব কর্ল্লে—কিন্তু কোথায় সেই ভাদ্রমাসের বৈঠকখানা ঘরের দিনগুলা, সেই মক্কা-মদিনা যাত্রী তাকিয়া-বালিশ, সে আনন্দের ঢেউ? Where is that child?···সিধুবাবুও নেই—কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা।

পথে একটা মারামারি হচ্ছিল, পিকেটিং-কারী এক বালককে নাকি পুলিশে খুব মেরেচে, তাই নিয়ে। বাসে করে বায়োস্কোপ দেখ্‌তে গেলাম ও সেখান থেকে অনেক রাত্রে এলাম ফিরে।

আজ রবিবাসরের অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম, সেখানে রাজশেখর-বাবুর সঙ্গে আলাপ হোল, 'অপরাজিত' তাঁর খুব ভাল লেগেচে বল্‌ছিলেন।

আজ ক'দিন থেকে মনে কেমন একটা অপূর্ব্ব ধরণের আনন্দ পাচ্ছি তা বল্‌বার নয়, লিখে প্রকাশ করবার নয়—সে শুধু বুঝ্‌তে পারি—বোঝাতে পারি নে।

এইমাত্র জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বারান্দাটাতে একা বসে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আকাশের দু-একটা নক্ষত্রের দিকে চেয়ে এই অপূর্ব্ব ভাবটাই মনে

আস্‌ছিল···আনন্দ মানুষকে এত উচ্চেও ওঠাতে পারে! সেয়ত বলে মনে হচ্ছিল নিজেকে, সত্য বলে মনে হচ্ছিল, বিরাট ও শাশ্বত [illegible] ···এক উন্মাদনাময়ী প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি!···মুগ্ধ হয়ে গেলাম···

দু' একটা চরণ গান তৈরী করে গুন্‌-গুন্‌ করে গাইলাম :—

মনে আমার রঙ্‌ ধরেচে আবার সুরের আসা-যাওয়া,—

আজ ক'দিন থেকেই এরকমটা হচ্চে।

দিনগুলো যে ভয়ানক নিরানন্দ হয়ে উঠেচে একথার কোনো ভুল নেই। এ শুধু হয়েচে সকাল থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত ভয়ানক খাটুনির জন্যে। অনবরত পরের খাটুনি, নিজের জন্য এতটুকু ভাববার অবকাশ নেই, অবসর নেই,—সকাল দশটা থেকে আরম্ভ করে রাত দশটা পর্য্যন্ত বারো ঘণ্টা। মনের অবকাশ মানুষের জীবনের যে কত দরকারী জিনিস তা এক কর্ম্মব্যস্ত, যন্ত্রযুগের অত্যন্ত কর্ম্মঠ, হিসাবী ও সময়জ্ঞানসম্পন্ন মানুষেরা কিছু বুঝবে কি? এতে মানুষকে টাকা রোজগার করায়, ভাল খাওয়ায়, ভাল পরায়, ভাল গাড়ী-ঘোড়া চড়ায়—অর্থাৎ ব্যক্তিত্বকে আরও জাগিয়ে নাচিয়ে তোলে—শক্ত করে বাঁচিয়ে রাখে, বেশ সুষ্টুভাবে ও কৃতীর সুনামে বাঁচিয়ে রাখে—কিন্তু ভারবাহী চোখে-ঠুলি বলদের থেকে কোনো পার্থক্যের গণ্ডী টেনে দেয় না—জীবনকে মরুভূমি করে রেখে দেয়,—টাকার গোছের আবাদ। প্রকৃতির শ্যামল বন্য সম্ভার, নীল আকাশ, পাখীর কূজন, নদীর কল মর্ম্মর, অস্ত-দিগন্তের সান্ধ্যমায়া—এ সব থেকে বহুদূরে, এক জনহীন, জলহীন বৃক্ষলতাহীন মরু। এদের দেশ-ভ্রমণেও যেতে দেখেচি ফার্স্ট ক্লাস কামরায় চেপে, দশদিনের ভ্রমণে দুই হাজার টাকা ব্যয় করে, মোটরে করে যাবতীয় স্থান এক নিঃশ্বাসে বেড়িয়ে, বিলাতী হোটেলে খানা খেয়ে, হুইস্কি টেনে—সেও ঐ ভেড়ার দলের ভেড়ার মত বেড়ানো।

আজ বসে বসে শুধু মনে হচ্ছিল অনেকদিন আগে বাল্যের নবীন মধুর বর্ষায় বৈকালগুলি—কি ছায়া পড়্‌তো, কি পত্রপুষ্পের সুগন্ধ বেরুতো—কি পাখীর গান হোত—জীবনের সম্পদ হোল সে সব—এক মুহূর্ত্তে জীবনকে বাড়িয়ে তোলে, বৃদ্ধিশীল করে—আত্মার পুষ্টি ওখানে। ধ্যান অর্থাৎ **contemplation** চাই, আনন্দের অবকাশ চাই—তবে হোলো আত্মার পুষ্টি—টাকা রোজগারের ব্যস্ততায় দিনরাত কাটিয়ে দেওয়ায় নয়।

মানুষের জীবনে প্রকৃতি একটি মহাসম্পদ, এর সঙ্গে অসহযোগ কল্লে জীবনটার প্রসারতা কমে যায়, রোমান্স কমে যায়, common place হয়ে পড়ে নিতান্ত।

আমি নিজেই বুঝতে পারি, এই ভাদ্র মাসের ঠিক এই সময়কার ১৯২৭ সালের ডায়েরীগুলো যদি পড়া যায় তবেই দুই জীবনে আকাশ-পাতাল তফাৎটা ভালো করে বোঝা যাবে।

১৯২৫ সালে এই সময়ে বিভূতিকে পড়াতুম মনে আছে, সে এখন কত বড় হয়ে গিয়েছে—এখন আবার অন্য ছেলেদের পড়াই ঠিক এই সময়টীতে, সে-কথা হোলো আজ। এদের এখানে প্যাক বাক্সের গন্ধ, ছেলেগুলোও দুষ্টু।

জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা ভাবছিলুম। একদিন উপেনবাবুকে বলেছিলুম, বাল্যের অমুক দিনটা থেকে যদি জীবন আবার আরম্ভ হোত……? আজও তাই ভাবি—জীবনের experience আমাদের খুব বেশী না,—সমৃদ্ধ খুব, একথা বল্‌তে পারি না অন্য অনেকের জীবনের তুলনায়। সামান্য একটু ভাগলপুর যাওয়া, সামান্য এক আবেষ্টনী, নতুন ধরণের জীবনের স্পর্শ, বড়লোকের বাড়ী—এই সব। কিন্তু এতেই আনন্দ এত বেশী দিয়েচে যে, এ থেকে এই কথাটাই বার বার মনে হয় যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের আনন্দ প্রত্যেকের মনেই ভগবান্ দিয়েচেন, যে কোন জিনিষকে উপলক্ষ করে হোক্ সেটা ব্যয়িত হবেই হবে।

অনন্ত জীবনে আরও কত অভিজ্ঞতা হবে, সেই কথাই ভাবি। আরও কত উন্নত ধরণের জীবনযাত্রা, কত অপূর্ব্ব আনন্দের বার্ত্তা!

এ রবিবার দিনটাও একটা ট্রামের সারাদিনের টিকিট বন্ধুর ছেলে তরুকে দিয়ে কিনিয়ে আনলুম শিয়ালদহ থেকে। এদিন বেরোলুম সকাল সাড়ে ছ'টার সময়ে। প্রথমে উপেনবাবুর বাসা। সেখান থেকে গেলাম ভবানীপুর সোমনাথবাবুর বাড়ীতে। খানিকটা গল্পগুজব করার পরে গেলাম প্রমথ চৌধুরীর বাড়ী বালিগঞ্জে। তিনি আমার বইখানা পড়ে খুব খুশী হয়ে আমার সহিত পরিচিত হবার ঔৎসুক্য জানিয়েছিলেন, এ কথা সোমনাথবাবু আমাকে লেখেন—তাই এ যাওয়া। তিনি নাকি বলেচেন—In Europe, he could have been a celebrity; কিন্তু এখানে কে খাতির করবে?… তারপর আমার বইখানা সম্বন্ধে প্রমথবাবু নানা কথা বললেন—দেখলাম

বইখানি খুব ভাল করে পড়েচেন। দুর্গার সিন্দুর-কৌটা চুরি ও সেটা কলসী থেকে বেরুনোর উল্লেখটা বার বার কর্ল্লেন।

সোমনাথবাবু আমাকে এসে পার্কসার্কাসে ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে চলে গেলেন —বল্লেন, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে একটা ভারী লাভ হলো বলে মনে করচি।

ওখান থেকে এসে গেলাম [illegible] মেসে—খানিকটা গল্পগুজব করার পরে গেলাম নন্দরাম সেনের গলি ও বাগবাজারে। তারপর হরি ঘোষের ষ্ট্রীটে কালোদের বাসাতে। দুপুর তখন দুটো, বাইরের ঘরে বুড়ো ছিল, খিন্নুও এখানে আছে দেখলাম্—খিন্নু কাছে এসে বস্‌লো, অনেক গল্পগুজব কর্ল্লে। কালোর ছেলে এনে দেখালে। ঠিক যেন মায়ের পেটের বোনের মত সরল ব্যবহার কর্ল্লে। ভারী আনন্দ হোলো দেখে। ওরা সবাই এল—সরবৎ করে আনলে খিন্নু—ভারী ভাল লাগ্‌লো।

ওখান থেকে তিনটের সময় বেরিয়ে দক্ষিণাবাবুর বাড়ী, সেখানে অনেকক্ষণ গল্পগুজবের পর জলযোগ হোল। চা-পানের পর সেখান থেকে বা'র হয়ে নিকটেই মহিম হালদার ষ্ট্রীটে রবি-বাসরের অধিবেশনে যোগ দিলাম— সেখানে বেলা পাঁচটা থেকে রাত ন'টা। অনেক রাত্রে ট্রামে বাসায় ফিরলাম।

আজকাল সেই মধুর দিনগুলি হারিয়ে গেছে—বহুদিন দেশে যাইনি— আজ বিকেলে স্কুলবাড়ীর ছাদ থেকে বহুদূরের দিকে চেয়ে কতকাল আগের কথা মনে হচ্ছিল—মনে হচ্ছিল অনেককাল আগের সেই মাকাল ফল, পট্‌পটি গাছের সময়টা এই—কত নতুন লতাপাতা গজিয়েচে—ভাদ্র দুপুরের খররৌদ্রে জানালার ধারে বসে সে-সব মধুর জীবন-যাত্রার দিনগুলি—কত সুখদুঃখ-ভরা শৈশবের সে জগতটা।...কোথায় কতদূরে যে চলে গিয়েচে! আজকাল সময় পাই না, স্কুলের পরই পর পর দুটো ছেলে পড়ানো— একটুখানি ভাববার সময় পাইনে, দেখ্‌বার সময় পাইনে, তবু যতটুকু সময় পাই দুর্ভিক্ষের ক্ষুধায় হাঁ করে যেন আকাশটার দিকে চেয়ে। একটুখানি অপরাহ্ণকে স্কুলের তেতলার ছাদটা থেকে দেখি—আবার সেই জীবন-সন্ধ্যা ও মাধবী-কঙ্কনের দিনগুলি আগতপ্রায়। এখন দেশে পাটের আঁটি কাচ্‌বে, খুব পাকাঠী পড়ে থাকবে। সেই জেলেকা, রংমহাল শিস্‌মহাল, শিবাজীর দিনগুলি আরম্ভ হবে। এই যে অভাব, না দেখতে পাওয়া,—আমাদের মনে হয় এই ভালো। এতে মনের তেজ খুব বাড়ে, দৃষ্টির intensity আরও বেশী হয় এটা বেশ বুঝি।

একটা কথা এই মাত্র ভাবছিলাম, রামায়ণ মহাভারতের যুগের পূর্ব্বে ভারতের বালকেরা, বৃদ্ধেরা কি ভাবতো—তখন জীবনের ভাব-সম্পদ ছিল দীন—সীতার অশ্রুজল তখন ছিল লোকের অজ্ঞাত, ভীষ্মের সত্যনিষ্ঠা, শ্রীকৃষ্ণের লীলা, এ সব তো জান্‌তো না। বুদ্ধের কথা বাদ দিলাম, অশোক, চৈতন্য, মোগল বাদশাহগণ, এই সমস্ত Tragic possiblity ভবিষ্যতের গর্ভে ছিল লীন—তবে তখনকার লোকে কি ভাবতো, কবিদের, ভাবুকের, গায়কের, চিত্রকরের উপজীব্য ছিল কী?

আর পাঁচশত বছরের সম্ভাবতার কথা মনে উঠেচে। আরও কত Tragedy-র বিষয়, ভাবুকতার ইতিহাস ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে এর মধ্যে। সেটা এখনই গড়ে উঠচে, কিন্তু আমরা তার সমস্তটা এক সঙ্গে দেখতে পাচ্চিনে। এই ইংরাজ চলে যাবে একদিন—এই সব স্বাধীনতা সংগ্রাম, এই গান্ধী, নেহরু, চিত্তরঞ্জন, এই নারী-জাগরণ, কাঁথির এই অশ্রুতীর্থ—ইতিহাসে এসব কথা নব নব ভাবের জন্মদাত্রী হবে। এসব ঘটনা জাতির মনের মহাফেজখানায় অক্ষয় আসনের প্রতিষ্ঠা করবে।

কাল সারা দিনটা বড় ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কাটলো—প্রবাসী আফিসে একটা কাজ ছিল। ঠিক বেলা বারোটার সময় সেখান থেকে বা'র হয়ে গেলাম প্রেসিডেন্সী কলেজে রবীন্দ্র-পরিষদে। নীহারবাবু বল্লেন, পথের পাঁচালীকে আমি তরুণ সাহিত্যের মধ্যে উচ্চ আসন দিই। প্রমথবাবু আবার বইখানির কথা অনেক ছাত্রদের বল্‌ছিলেন। প্রতুল গুপ্ত বলে ছেলেটী বঙ্গ-সাহিত্যের বিজয়ী সেনাপতি বলে অভ্যর্থনা কর্ল্লে। সোমনাথ বাবু বল্লেন, আপনি বর্ত্তমান আধুনিকতম সাহিত্যের বড় ঔপন্যাসিক—আপনাকেও কিছু বলতে হবে। খুব আনন্দে কাটল।

ওখান থেকে বা'র হয়ে যাবার কথা ছিল সাহিত্য-সেবক-সমিতির অধিবেশনে, কিন্তু তা আর যাওয়া সম্ভব হোল না। প্রমথবাবুর সঙ্গে গল্প কর্ত্তেই বেজে গেল ন'টা। অতুল গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন—তিনি আমার বইখানার খুব প্রশংসা কর্ল্লেন। তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন ল' কলেজে। তাঁকে বল্লুম সে-কথা।

আজ একবার দুপুরে কাজে গিয়েছিলাম অক্ষয়বাবুদের বাড়ীতে। শীতল

একখানা হাতের লেখা মাসিক পত্র বা'র করচে, তাতে লেখা দিতে বল্‌চে। কাল সে আস্‌বে বেলা তিনটের সময়।

সেখান থেকে পার্ক সার্কাসের ট্রামে ফিরছিলুম—বৈকাল ছ'টা। পূব-দিকের আকাশ অন্ধকার হয়ে আসচে। শিয়ালদহের কাছটায় ট্রামটা এলেই আজকাল পূব দিকে চাই। অন্যদিনও চাই—এমন হয় না—আজ যে কী অপূর্ব্ব মনে হোল।···মাকাল ফল, পিসিমা, পুরানো বঙ্গবাসী, দুপুরের রৌদ্র, মাকাল গাছ, ঘুঘু পাখী, বাঁশবন—কত কথা যে এক মুহূর্ত্তে মনে এল! আমি এরকম আনন্দ একদিন মাত্র পেয়েছিলাম,—সেদিনটা স্কুলের ছাদ থেকে বহুদূরের আকাশটার দিকে চেয়েছিলাম এই সন্ধ্যা ছ'টার সময়ে।

তারপরে স্বরি লেনের কাছে নেমে গেলাম রাজকৃষ্ণদের বাড়ী যাব বলে।

আমি শুধু প্রার্থনা করি, আমাকে আগে নিয়ে চল হে ভগবান—যাতে সর্ব্বদা মন গতিশীল থাকে। কিসে মন বৰ্দ্ধিত হয়, আনন্দ বৰ্দ্ধিত হয়, তার সন্ধান তোমার জানা আছে, আমাদের নেই—তা ছাড়া আমার শিল্পী মন কি করে আরও পরিপুষ্ট হবে তার সন্ধান তুমিই জানো।

তোমার যে দিকে ইচ্ছা সে দিকেই নিয়ে যেও।

অবশেষে ঘুরিয়া যাওয়াই ঠিক করে কালকার বম্বে মেলে বা'র হয়ে পড়া গেল। দিনটা ছিল খুব ভাল—বৈকালের দিকে ট্রেণটা ছাড়্‌ল—বর্ষাশেষে বাংলার এ অংশটায় শ্যামল-শ্রী দেখে বুঝ্‌তে পারলাম বাংলা বাংলা করি বটে, কিন্তু দেশের সমগ্র পরিপূর্ণতাকে কখনো উপভোগ করি নি—কী অপূর্ব্ব অস্ত-আকাশের রঙীন্ মেঘস্তূপ, কী অপরূপ সন্ধ্যার শ্যামছায়া!··· কোলাঘাটের যে এমন রূপ, তা এর আগে কে ভেবেছিল?—পিছন থেকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লাম, দেশের ভিটা সেদিন দেখে এসেচি, তারই কথা মনে হোল—সেই ঝিকুরে গাছগুলো সন্ধ্যার ছায়ায় বাল্যের আনন্দ-ভরা এক অপরাহ্ণের ছায়াপাতে মধুর হয়ে উঠেচে এতক্ষণ—এই তো পূজার সময়, বাবা এতদিন বাড়ী এসেচেন, আমাদের পূজার কাপড় কেনা হয়ে গিয়েচে এতদিন—কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রির উৎসবের সে সব আনন্দ—কি জানি কেন এই সব সময়েই তা বেশী করে মনে আসে।

সব সময় এই দেশের ভিটার ছবিটাই মনে উৎসাহ, আনন্দ ও প্রেরণা দেয়—এ অতি অদ্ভুত ইতিহাস।

বিলাসপুর নেমে ঝড় বৃষ্টি। এখন একটু রৌদ্র উঠেচে—গাড়ীর মধ্যে বসে বসে লিখ্‌চি—কিন্তু মেঘের ঘোর এখনও কাটে নি।

পরশু বৈকালটা সজনীবাবু, সুবলবাবু ও গোপালবাবুর সঙ্গে বেশ কেটেচে। প্রথমে রেষ্টুরেন্টে কিছু খেয়ে মোটরে করে গেলাম লেকে—সেখান থেকে আউট্রাম ঘাট—সেখানে চা-পানের পর বাসা। ডাঃ সুশীল দে'র ওখানেও ঘণ্টা তিন-চার গল্প করে ভারী আনন্দ হোল।

কারগী রোডে পৌছে দেখ্‌লাম কিছুই আসে নি, অতি বর্ষণের ফলে বন্যা হওয়াতে রাস্তা ভেঙে গিয়েচে—গন্তব্য স্থানে পৌছতে দুই-তিন দিন লাগবে—আরও একটী সাহেব আমারই মত বিপন্ন হয়ে পড়েচেন—সুতরাং প্রত্যাবর্ত্তনই যুক্তিযুক্ত মনে হোল। একজন বাঙ্গালী ওভারসিয়ার ছিলেন, তাঁর নাম সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য্য—তিনি সঙ্গে করে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন—বেশ লোক।—ঝিঙ্গে ও ঢেঁরস ভাজা, ডাল ও ভাত।

ওধারকার রাঙা মাটীর দেওয়াল, বেশ দেখতে। মনে হোল ওরকম বাড়ীতে আমি তো একেবারেই টিকতে পারবো না। সঙ্গে করে দেখালেন, পাশেই জমি কিনেচেন—সেখানে তরকারীর বাগান। একটী গালার কারখানায় নিয়ে গেলেন—গালা চোলাই হচ্চে—একটা অপ্রীতিকর গন্ধ। সেখান থেকে এসে খাওয়া-দাওয়ার পরে সাম্‌নের পাহাড়টাতে ওঠা গেল। ওপারে আর একটা পাহাড়—মধ্যে ঘন শাল পলাশের বন—মহিষের গলায় একটানা ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যাচ্চে। ওখানকার একজন খৃষ্টান ডাক্তার জানপান্নার বিবাহ গেল সেদিন, বিবাহ উপলক্ষে অনেকগুলি সাহেব, মেম ও বাঙ্গালী খৃষ্টান মেয়ে এসেছিলেন—এই ট্রেণে যাচ্চেন।

বিলাসপুরে গাড়ী পেয়ে গেলাম ঠিক মত—ভিড় খুব বেশী ছিল না। বিলাসপুরের ও রায়গড়ের মধ্যেকার আরণ্য ভূভাগের দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব—কিন্তু দুঃখের বিষয় সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিকে নাম্‌বার পরেই অধিকতর অপরূপ এমন আর এক বনভূমির ভিতর দিয়ে ট্রেণ যেতে লাগল, যার তুলনায় পূর্ব্বে যত-গুলো দেখেচি সব ছোট হয়ে গেল, তুচ্ছ হয়ে গেল—সেটা হচ্চে রায়গড় ও ঝারসাগুদার মধ্যে—সে অপরূপ আরণ্যভূমির বর্ণনা চলে না। দিবাশেষের ঘন ছায়ায় অনতিস্পষ্ট সে দৃশ্যের মত গম্ভীর অন্য কোনো দৃশ্য জীবনে দেখি নি কখনও—চন্দ্রনাথের পাহাড়ও নয়। কি প্রকাণ্ড পাহাড়টাই বরাবর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চক্রধরপুর পর্য্যন্ত এলো!···মাঝে মাঝে সাদা মেঘগুলো পাহাড়ের

গায়ে লেগে আসে, যেন কুমারেরা পণ পুড়ুচ্চে—নীল মেঘের মত পাহাড়টার শোভাই বা কি ! লোকে ভেবে দেখে না, মনের সতর্কতা কম, তাই সেদিন সেই লোকটা বল্লে মশাই এ অঞ্চলে সবই barren…barren কোথায় ? তারা কি চক্রধরপুরের পরের এই গম্ভীর-দৃশ্য বনানী দেখে নি ?…

আমি মনে মনে বুঝে নিলাম পিছনের ওই নীল পাহাড়টা, মেঘরাজি যার কোলে সন্ধ্যাবেলাতে দুষ্টু ছেলের মত ঘুমিয়ে পড়েচে—ওটা আর রেলের পিছনের মাঠগুলো নিয়ে একটা প্রকাণ্ড ত্রিভুজ তৈরী হয়েচে—দেড়শত দুইশত বর্গ মাইল পরিমাণের এই ত্রিভুজটায় সবটাই বসতিবিরল, স্থানে স্থানে একেবারে জনহীন অরণ্য, পিছনে বরাবর ওই পাহাড়টা। এই অরণ্যভূমি ও শৈলমালার মধ্য দিয়ে রেলপথটা চলে গিয়েচে। সহসা একটা পাহাড়ের মেঘে ও কুয়াসায় ঢাকা শিখরদেশের কি অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা।… গাড়ীর সবাই বল্লে—ত্যাখো, ত্যাখো—আমার তো হৃদয় বিস্ফারিত হোল, চারিধারের এই অপূর্ব্ব বনভূমির শোভা দেখে অন্ধকারে পর্ব্বত-সানুস্থিত অরণ্যের মধ্যে কোথা থেকে সদ্য ফোটা শেফালি ফুলের সুবাস পেলাম—ট্রেনটাও Rock cutting-টা ভেদ করে ঝড়ের বেগে ছুটেচে—চারিধারে রহস্যাবৃত অন্ধকারে ঢাকা সেই শৈলপ্রস্থ ও অরণ্য-ভূভাগ—জীবনে এধরনের দৃশ্য কটাই বা দেখেচি !…রাত আটটায় এসে বম্বে মেল ঝারসাগুদাতে দাঁড়াল। এখানে চা ও খাবার খেয়ে নিলাম। সেদিনকার মত উদার-হৃদয় সহচর তো আজ সঙ্গে নেই যে খাবার খাওয়াবেন।

ঝারসাগুদা থেকে সম্বলপুরে এক লাইন গিয়েচে। রাত্রে ট্রেনে বেশ ঘুম হোল, সকালে এসে কল্‌কাতায় উঠ্‌লুম…দুপুরটা ঘুম হোল খুব।

আজ বিজয়া দশমী। কোথায় যাব ভাবচি—বিভূতিদের ওখানেই যাওয়া যাবে এখন।

আজ সারাদিনটা হৈ হৈ করে কাটল। সকালে উঠেই সজনীবাবুদের বাড়ী—সেখানে খানিকক্ষণ গল্পগুজবের পর সকলে মিলে নি:ঃনবাবুদের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে যাওয়া গেল। সেখানে হোল পিক্‌নিক্—মাংস সিদ্ধ হতে বাজ্‌ল তিনটে। Living age কাগজখানাতে মেটারলিঙ্ক-এর নতুন বই 'Life of the Ants' সম্বন্ধে একটা ভারী উপাদেয় প্রবন্ধ পড়ছিলাম—সামনের পাইকপাড়া রাজাদের বাগানটীতে—আরামের স্নিগ্ধ ছায়া

বর্ষাশেষের সরস, সবুজ গাছপালার উপর নেমে আস্‌চে, ওধারের তাল-গাছগুলো মেঘশূন্য নীলাকাশের পটভূমিতে ওস্তাদ পটুয়ার হাতে আঁকা ল্যাণ্ডস্কেপের ছবির মত মনোহর হয়ে উঠেচে—কিন্তু আমি এই বৈকালটীকে আমার মনের সঙ্গে কি জানি আজ মোটেই খাপ খাওয়াতে পারচিনে—আমার মনের সুসম্বদ্ধ, সুনির্দ্দিষ্ট অপরাহ্ণের মালায় আজকার বেলগেছিয়া বাগানের ও সুন্দর অপরাহ্ণটী বিস্তৃত শত অপরাহ্ণ-মুক্তাবলীর পাশে কেন যে স্থান দিতে পারলাম না, তা জানি না। সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম শাঁখারিটোলায় রাধাকান্তদের বাড়ী, তারপর দক্ষিণাবাবুদের বাড়ী ভবানীপুরে। দক্ষিণাবাবু বাড়ী নেই। জ্যোৎস্না আদর-অভ্যর্থনা কর্ল্লে কাছে বসে খাওয়ালে। রাত এগারটার পরে এলেন দক্ষিণাবাবু। গল্প গুজবে হোল রাত আড়াইটা—আজ আবার চন্দ্রগ্রহণ, কিন্তু মেঘের জন্যে কিছু দেখা গেল না। সারারাতের মধ্যে চোখের পাতা বুজানো গেল না মশায় ও গরমে—অনেক রাত্রে দেখি একটু একটু বৃষ্টি পড়্‌চে।

এবার কালী পূজাতে দেশে গিয়ে সত্যই বড় আনন্দ পেলাম--এত সুন্দর গন্ধ বন-ঝোপ থেকে ওঠে হেমন্তের প্রথমে, এবার খুঁজে খুঁজে দেখলাম গন্ধটা প্রধানতঃ ওঠে বনমরিচার ফোটা ফুল থেকে ও কেনেকোঁড়ার ফুল থেকে। এবার আনন্দটা সত্যই অপূর্ব্ব ধরণের হোল—যা অনেকদিন কল্‌কাতায় থেকে অনুভব করি নি। নৌকার ওপর বসে বসে যেন জীবনটা আর একটা dimension-এ বেড়ে উঠ্‌ল—ঘন লতাপাতার সুগন্ধে অতীত বহু জীবনের কথা মনে পড়ে—খুকী দ্বিতীয়ার দিন আমার সঙ্গে আবার গেল বারাকপুরে—সেদিন আবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। জাহ্নবী আমাকে ফোঁটা দিলে—খুকী দিলে খোকাকে। পরে আমরা দু'জনে পাকা রাস্তার ওপরে বেড়াবো বলে বেরুলাম—কিন্তু যাওয়া হয়ে গেল একেবারে বারাকপুরে—গাছপালা প্রকৃতির সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করে যে জীবন—তাই হয় সুখের, পরিপূর্ণ আনন্দের। এ আমি ভাল করে বুঝ্‌লাম সেদিন।

কয়দিন এখানে এসেও বেশ আনন্দেই কাট্‌ল—ঊষাদেবী এখানে এসেচেন ঢাকা থেকে, তাঁর ওখানে মধ্যে একদিন চা-এর নিমন্ত্রণে গিয়ে অনেকক্ষণ আলাপ কর্ল্লুম—বেশ মেয়েটি—বেশ শিক্ষা আছে, সাহিত্য বিষয়ে সমঝদার খুব সুন্দর। সুনীতিবাবুর বাটীতে একদিন আমি ও সজনীবাবু গিয়ে—

অনেকগুলা গ্রীক্ ও শক মুদ্রা, অনেক ছবি, আবুরাজ্যের প্রাচীর গাত্রে উৎকীর্ণ কতকগুলো মূর্ত্তির ফটো—এই সব দেখে এলাম—প্রবাসী অফিসে আড্ডা যা চল্‌চে ক'দিন, তাও খুব।

কাল জগদ্ধাত্রী পূজা—আমাদের চারিদিন ছুটি আছে, রাত্রে গেলাম বিভূতিদের বাড়ী, অন্য অন্য বছরের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে—আজ কোথাও কিছু নেই—রাত ন'টার সময় অক্ষয়বাবু ছোট বৈঠকখানায় রেডিও শুনচেন—অন্য বছর যে সময় আগন্তুক ও নিমন্ত্রিতের ভিড়ে সিঁড়ি দিয়া ওঠা সম্ভব হ'ত না, কোথায় সে উৎসব গেল বাড়ীর—যেন দীন হীন, মলিন সব ঘরগুলো, সিঁড়িটা, দালানটা। আমাকে অবশ্য খাওয়ার বিশেষ অনুরোধ করা ছিল—অক্ষয়বাবু ও খগেনবাবু বাইরের নিমন্ত্রণে গেল মেজ খোকাবাবুর বাড়ী। অনেক রাত্রে আমি, শীতল, বিভূতি একসঙ্গে বসে নিরামিষ ভোজ খেলাম। রাত বারোটাতে বাসায় ফিরলাম। শুয়েচি—চারিধার নিস্তব্ধ, নির্জ্জন। চাঁদটা পশ্চিম আকাশে নিষ্প্রভ হয়ে ঢলে পড়েচে—নক্ষত্রগুলো পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়েচে 'অপরাজিতে'র অপুর বন্যজীবনের গোড়াটা লিখ্‌চি—তাই বসে বসে ভেবে এই বিচিত্র জীবনধারার কথা মনে হোল—ভারী আনন্দ পেলাম।

আজ জগদ্ধাত্রী পূজার সকালবেলাটা ; মনে পড়ে অনেক বছর আগে এই ঘরেই বসে বসে হার্ডির ছোট গল্প পড়তুম এইখানে। আজও সেই ঘরটা তেমনি নিস্তব্ধ, নিশ্চল। কিন্তু পরিবর্ত্তনও কি কম হয়েচে! তখনকার বিভূতি কত বড় হয়ে গিয়েচে—তখনকার সবাই কে কোথায় চলে গিয়েচে।

আগামী রবিবারে সুনীতিবাবু, অশোকবাবু, আমি ও সজনীবাবু চারিজনে মোটরে 'পথের পাঁচালী'র দেশ দেখ্‌তে যাওয়ার কথা আছে বৈকালের দিকে। দেখি কি হয়।

এইমাত্র মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তাঁর নব প্রকাশিত 'কিশলয়' বইখানা পাঠিয়েচেন, দেখ্‌লাম। খুব ভাল লাগ্‌ল বইটা।

আজকার দিনটা বেশ ভাল কাট্‌ল। সকালের দিকে খুব মেঘ ছিল, কিন্তু দুপুরের পরে খুব রৌদ্র উঠ্‌ল—তখন বেরিয়ে পড়া গেল—প্রবাসী অফিসে গিয়ে দেখি অশোকবাবু ও সজনী দাস বসে। চা পানের পরই

সজনীবাবু গিয়ে গাড়ী করে স্থনীতিবাবুকে উঠিয়ে নিয়ে এল—পরে আমরা রওনা হলাম আমাদের গ্রামে। সজনীবাবু, অশোকবাবু, স্থনীতিবাবু আর আমি। যশোর রোডে এসে ব্যাটারির তারটা হঠাৎ জ্বলে উঠে একটা অগ্নি-কাণ্ড হোত, কিন্তু স্থনীতিবাবুর কুঁজোর জল দিয়ে সেটাকে থামানো গেল।

তারপরই খুব জোরে মোটর ছুট্‌ল—পথে মাঝে মাঝে রোদ, মাঝে মাঝে ছায়া—রোদই বেশি। আজ রবিবার, সাহেবরা কল্‌কাতা থেকে বেড়াতে বেরিয়ে এক এক গাছতলায় মোটর রেখে ছায়ায় শুয়ে আছে।

তারপর পৌছে গেলাম জোড়া-বটতলায়। ওখানেই মোটরখানা রৈল, কারণ দিনকয়েক আগে আমাদের গ্রামের দিকে খুব বৃষ্টি হয়েছিল, পথে এখনও একটু একটু কাদা। নেমে কাঁচাপথটা বেয়ে বরাবর চল্লুম, স্থনীতিবাবু কাঁচা কোনো কুল ও সেঁয়াকুল খেতে খেতে চল্লেন, অশোকবাবুর ছড়ি কাট্‌বার কথা বল্‌তেই সজনীবাবু চটি ফেলে ছুট্‌ল গাড়ীতে ছুরী আনতে। গ্রামে ঢুকবার আগে এ-ফুলের ও-ফুলের নাম সব বলে দিলাম—কাঁঠাল-তলায় হেলা গুঁড়িতে গিয়ে সবাই বস্‌ল। তারপরে সইমার বাড়ী গিয়ে কিছু মুড়ির ব্যবস্থা করে একটা আসন পেতে সবাইকে বসালাম। সেখানে খাওয়া ও গল্পগুজবের পরে আমাদের পোড়ো ভিটেটা দেখে রান্নাঘরের পোতা দিয়ে সবাই নেমে ঘন ছায়ায় ছায়ায় এলাম সল্‌তেখালি আমগাছের তলায়—সেই ময়না-কাঁটা গাছ থেকে ছড়ি কেটে নিলে অশোকবাবু ও সজনীবাবু—পরে তেঁতুলতলীর তলার বনের মধ্যে দেখা গেল একটা খুব বড় ও ভাল ময়না-কাঁটা গাছ—সেখান থেকে আর একটা ছড়ি কাটা হোল। তারপর প্রায় বেলা গেল দেখে আমি খুব তাড়াতাড়ি করলাম—ওদের বন থেকে টেনে বা'র করে নিয়ে গেলুম কুঠীটায়। ছেলেবেলায় গ্রামের জামাইদের ডেকে নিয়ে কুঠী দেখাতুম। তারপর সে কাজটা অনেকদিন বন্ধ ছিল—বহুকাল বন্ধ ছিল। শেষে কাকে নিয়ে গিয়েছিলাম, তা তো মনে হয় না—বহুকাল পরে বাল্যের সে কুঠী দেখানো পুনরাবৃত্তিটা কল্লুম। তখন কুঠীটা আমার কাছে খুব গর্ব্ব ও বিস্ময়ের বস্তু ছিল—তাই যে কেউ নতুন লোক আস্‌তো, তাকেই নিয়ে ছুট্‌তাম কুঠী দেখাতে। আজ বহুদিন পরে সজনীবাবু, স্থনীতিবাবু ও অশোকবাবুকে নিয়ে গেলাম সেখানে। কুঠীতে কিছু নেই। আজকাল এত জঙ্গল হয়ে পড়েচে যে আমি নিজেই প্রথমটা ঠিক কর্ত্তে পাল্লুম না কুঠীটা কোন জায়গায়।

তারপর মাঠ দিয়ে খানিকটা ছুটতে ছুটতে গেলাম। রাস্তার পরে কাঁচিকাটার পুলে—এই কার্ত্তিকমাসেও একটা গাছে একবার সোঁদালি ফুল দেখে বিস্মিত হলাম। সেইখানে ঝোপটা কি অন্ধকারই হয়েচে! স্নুনীতিবাবু চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেন—সবাইকে ডেকে দেখালেন—আমার বেশ মনে হচ্ছিল আমার পরিচিত সল্‌তেখালি তলায় যেখানে আমিই আজকাল কম যাই—সেখানে—আমাদের ভিটেতে—সম্পূর্ণ কলকাতার মানুষ স্নুনীতিবাবু, অশোকবাবু, এ যেন কেমন অদ্ভুত লাগ্‌ছিল। আমাদের কুঠীর মাঠে, আমাদের সইমার বাড়ীর রোয়াকে!

সন্ধ্যা হোলে তেঁতুলতলার পথটা দিয়ে সবাই মিলে আবার ফিরলাম—ময়না-কাঁটার ডালগুলো ওখান থেকে আবার নিলাম উঠিয়ে—সইমার বাড়ী এসে দেখি হরেন এসে বসে আছে। সইমার সঙ্গে স্নুনীতিবাবুর খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা হোল—পরে আমরা বার হয়ে গিরীশ-দার বাড়ী এসে চা খেলাম—তখনই ওদের রান্নাঘরের পৈঠাতে জ্যোৎস্না উঠে গিয়েচে।

তারপরে গাজিতলার পথ দিয়ে হেঁটে মোটর ধরলুম—গোপালনগরের হাট ফের্ত্তা লোক বসে আছে মোটর দেখ্‌বার জন্যে। খানকতক স্যাণ্ডউইচ্‌ ও ডালমুট কিছু খেয়ে নেওয়া গেল—কুঁয়োর জল খেয়েটেয়ে গাড়ী ষ্টার্ট দেওয়া হোল।

বন্ধুর বাসায় এসে দেখি টকু বেচারীর চৌদ্দ পনর দিন জ্বর—বিছানায় শুয়ে আছে, বন্ধু ফোড়ায় শয্যাগত—বন্ধুর বৌ এসেচে, কিন্তু সে বেচারীর দুর্দ্দশার সীমা নেই। সেখানে কিছু চা ও খাবার খাওয়ার পরে আমরা সুন্দর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রে মাঠের ভিতর দিয়ে রাস্তায় সজোরে গাড়ী চালিয়ে রাত্রি সাড়ে ন'টাতে কল্‌কাতার বাসায় এসে পৌছলাম। তখনও বাসায় খাওয়া আরম্ভ হয় নি—ঠাকুর তখনও রুটী গড়্‌চে। আমি এসে টেবিল পেতে লিখ্‌তে বসে গেলাম, আর ভাব্‌ছিলাম এই খানিক আগে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হোল তখন ছিলুম আমাদের বাড়ীর পিছনকার গাবতলার পথে—এরই মধ্যে কলকাতার বাসায় ফিরে এত সকাল-রাত্রে বারান্দার আলো জ্বেলে বসে লিখ্‌চি, এ কেমন হোল?···

যদি মোটর না থাক্‌তো তবে কখন পৌছতাম?···সন্ধ্যার পরে বেরিয়ে সন্ধ্যার গাড়ী ধরে, বা বনগ্রাম থেকে ট্রেণ ধরে, রাত্রি বারোটাতে কলকাতা পৌছতাম।

আমি সত্যই আজ একটা আনন্দ পেলুম। একটা অদ্ভুত—ও সুন্দর ধরণের আনন্দ পেলুম। ওঁরা গিয়েছিলেন 'পথের পাঁচালী'র দেশ দেখ্‌তে—আমি আমার পরিচিত ও প্রিয় স্থানগুলিতে কলকাতার এই প্রিয় বন্ধুদের নিয়ে বেড়িয়ে আজ সত্যই একটা নতুন ধরণের আনন্দ পেলুম—যা আর কখনো কোনো trip-এ পাই নি।

ইচ্ছা আছে বৈশাখ মাসের দিকে একবার এদিকে এসে, ওঁদের নিয়ে ইছামতীতে নৌকা ভ্রমণ ও কোনো একটা বনের ধারে বনভোজন করা হবে—সুনীতিবাবুও সে প্রস্তাব কর্ল্লেন—সবাই তাতে রাজী।

কাল দুপুরে সিদ্ধেশ্বর বাবুর ঠাকুর-বাড়ীতে ছিল নিমন্ত্রণ, সেখানে সকলের সঙ্গে গল্পগুজবে বেলা হোল তিনটা, সেখান থেকে গেলুম 'গৈরিক পতাকা' দেখ্‌তে মনমোহনে।

এ গেল কালকার কথা—কিন্তু আজ এমন অপূর্ব্ব আনন্দ পেয়েচি বৈকালের দিকে যে, মনে হচ্চে জীবনে ক—ত দিন এ রকম অদ্ভুত ধরণের বিষাদের ও উত্তেজনার আনন্দ হয় নি আমার।

কিসে থেকে তা এল? অতি সামান্য কারণ থেকে। ক্লাসে—দেবব্রত নাকি ছোট একটা খড়ি নিয়ে পকেটে রেখেছে, ক্লাসের মনিটার তার হাত মুচ্‌ড়ে সেটা নিয়েচে কেড়ে। দেবব্রত এসে আমার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেল্লে; বল্লে, দেখুন স্যার, ওরা এত বড় বড় খড়ি নিয়ে যায় বাড়ীতে—আর আমি এইটুকু নিলাম—আমার হাত মুচ্‌ড়ে ও কেড়ে নিলে?···হাতে এমন লেগেচে!

ছোট ছেলের এ কান্না মনে বাজ্‌ল। তখনি অবশ্যি মনিটারকে বকে খড়িটুকু দেবব্রতকে ফেরৎ দেওয়ালাম, কিন্তু দুঃখটা আমার মনে রয়েই গেল।

সে কি অননুভূত দুঃখ ও বেদনা বোধ!···দুপুরের রোদে ছাদে বেড়াতে বেড়াতে মনে হোল ভগবান আমাকে এক অপূর্ব্ব ভাব-জীবনের উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে চান বুঝি—তিনিই হাত ধরে আমাকে নিয়ে চলেছেন কোথায়,—তাঁর কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, তিনিই জানেন—অনন্ত জীবনের কতটুকু আমাদের শান্ত-দৃষ্টির নাগালে ধরা দেয়? মনে হোল বহুকাল আগে শৈশবে হরি ঠাকুরদাদা সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ীর দরজা থেকে চাল চেয়ে না পেয়ে মলিন মুখে ফিরে গিয়েচেন—

সেই দিনটীতেই আমার এই ভাব-জীবনের বোধহয় আরম্ভ। তারও আগে মনে আছে—মা যেদিন অতি শৈশবে ছোলা ও মুড়ি খেতে দিয়ে দিদিমার কাছে তিরস্কৃত হয়েছিলেন—তাঁর গুরু এসেছিল, তিনি যে আমাদের জন্যে গুরুর পাতের মাছের ঝোল ও রুটী তুলে রেখে দিয়েছিলেন, মা তার খবর না জেনেই আমায় দিয়েছিলেন মুড়ি ও ছোলা ভাজা।—সেই ঘটনা থেকে মায়ের উপর এক অদ্ভুত স্নেহ ও বেদনা-বোধ—তার পরে জাহ্নবীর আমজরানো, পিসিমার শত দুঃখ, কামিনী পিসির কষ্ট, সেই যাত্রার দলের গান শেষ হওয়ার দিনগুলা—কত কি—কত কি ; তার পরে বিভূতির কত কষ্ট! আজ আবার দেবব্রতের কষ্ট—আমার সমগ্র ভাব-জীবনের সমষ্টি এই সব দুঃখ ও বেদনা, অবশ্য হয় তো অনেক দুঃখ বাস্তব, অনেকটা কাল্পনিক—কিন্তু আমার মনে তাদের জন্য বেদনানুভূতি আদৌ কাল্পনিক নয়—তাদের সার্থকতা সেইখানেই।

যাক্। তারপর স্কুলে এক অদ্ভুত ব্যাপার হোল। সন্ধ্যা হয়ে গেল, আমি ছাদে নীরব সান্ধ্য আকাশের তলে প্রতিদিনের মত পায়চারী কর্ত্তে লাগলাম—মনে এক অতীন্দ্রিয় আনন্দবোধ, সে আনন্দের তুলনা হয় না—ভেবে দেখ্‌লাম এই আনন্দেই জীবনের সার্থকতা। কিসে থেকে তা আসে সে কথা বিচারে কোনো সার্থকতা নেই আদৌ,—আনন্দ যে এসেচে, সেইটাই বড় কথা ও পরম সত্য। অনেক দিন পরে এ লেখা পড়ে আমারই মনের নিরানন্দ ও ভাবশূন্য মুহূর্ত্তে আমার মনে হতে পারে যে, এ দিনের আনন্দ একেবারেই অবাস্তব ও মনকে চোখ-ঠারা গোছের হয় তো—নিরানন্দের দিনে এ কথা মনে হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বটে, কিন্তু এই খাতায় কালীর আঁচড়ে তা জানিয়ে দিতে চাই যে তা নয়, তা নয়। এ আনন্দ অপূর্ব্ব অননুভূত, অতীন্দ্রিয়, মহনীয়!...এ ধরণের গভীর বেদনামিশ্রিত ভাবোপলব্ধি জীবনে খুব কম করেচি। করেচি হয় তো সে দিন মালিপাড়ায় মাজু খাতুনের উপর পুলিশের অত্যাচার করার কথাটা খবরের কাগজে পড়বার দিনটা—তারপর অনেক দিন হয় নি।

সন্ধ্যার নিস্তব্ধ ও ধূসর আকাশের বহুদূর প্রান্তের আমাদের ভিটাটার কথা মনে হোল একবার—বেশ দেখ্‌তে পেলাম সেখানে ঘন ছায়া পড়ে এসেচে—বনে সুগন্ধ উঠ্‌চে হেমন্তের দিনে—সেই ভিটা থেকে একদিন পথে, ঘাটে, বৈকালের ছায়ায়, দুপুরের রোদে যে আনন্দ-জীবনের শুরু, আমি

এই ভেবে মুগ্ধ হই, তা এখনও অটুট, অক্ষুণ্ণ রয়েচে—আরও পরিপূর্ণভাবে দেশে বিদেশে তার গতি নিত্য নবতর পথে।

আকাশের দিকে চাইলাম—মাথার উপর ধূসর আকাশে একটি নক্ষত্র মিট্‌ মিট্‌ করচে। সঙ্গে সঙ্গে কালকার থিয়েটারে শোনা গানটা গাইলাম, 'জনতার মাঝে জনগন পতি, বক্ষের মাঝে দৃপ্ত মন'। দেবব্রতের মত ক্ষুদ্র ও সুদর্শন এক দেবশিশুর ছবি মনে উঠ্‌ল ঐ ছবি বিশ্বের অজানা,—অচেনা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সে বালক তার অপূর্ব্ব শৈশব যাপন করচে আনন্দে, সহাস্য কলরব, দায়িত্বহীন কৌতুকের উচ্ছ্বাসে। তারপরে তার জীবনের সে সব বহুবর্ষব্যাপী বিরাট কর্ম্মযজ্ঞ, সে গভীর বেদনাপূর্ণ ট্রাজেডি—কত যুগব্যাপী দুঃখ সুখের গুরু—পৃথিবীর মানুষেরা যে কোনো দিন ধারণাই কর্ত্তে পারে না। উঃ, সে কি অদ্ভুত অনুভূতিই হোল যখন এ ছবি আমার মনে উঠ্‌ল।

আজ বুঝ্‌লাম এই অনুভূতিই আসল জীবন। আমি নিরানন্দ দিনগুলিতে দেখেচি মন কিছুতেই আনন্দ পেতে চায় না—টেনে টুনে কত করে কত নক্ষত্র জগৎ, এ, ও নানা ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে জোর করে আনন্দ আন্‌তে হয়, তা যাও বা একটু আধটুকু আনে—তাতেই তখন মনে হয়, না জানি কত বড় অনুভূতিই বুঝি বা হোল। কিন্তু আসল ও সত্যিকার আনন্দের মুহূর্ত্তে বোঝা যায় সে অনুভূতি ছিল অগভীর, মেকি, টেনে-বুনে-আনা। আসল আনন্দকে জোর করে, মনকে বুঝিয়ে, তর্ক করে আন্‌তে হয় না তা আজ বুঝেচি—সে সহজ—অর্থাৎ spontaneous.

আর ও অনুভূতি যার জীবনে না হয়েচে—অর্থের মানের, যশের প্রাচুর্য্যে তার দীনতা ঘোচাতে পারে না।

'অপরাজিত' উপন্যাসের বন-ভ্রমণ লিখ্‌চি আজ।

কাল স্কুল কমিটির মিটিং-এ ওরা সুবোধবাবুকে নোটিস্ দিলে—আমি আগে জান্‌লে হোতে দিতাম না—আমায় আগে ওরা জানায়ও নি,—যদিও সাহেবের কোনো দোষ ছিল না, সাহেব আমাকে জানাবার কথা বলেছিল সুরেশবাবুকে। শেষকালে চেষ্টা করেও কিছু করা গেল না—বেচারীকে যেতেই হোল। এই বেকার-সমস্যার দিনে একজন Young man-এর চাকুরী এভাবে নেওয়া বড় খারাপ কাজ, মনে বড় কষ্ট হোল—সুবোধবাবু মুখটী চুপ করে বস্‌লো কাল রাত্রে, কি করি আমার তো আর কোনো হাতই নেই!

আশ্চর্য্যের বিষয় আজ পয়লা অগ্রহায়ণ, কিন্তু এত গরম যে সকালে কার্ত্তিক পূজার ছুটীর দিনটা বলে রমাপ্রসন্নর ওখানে বেড়াতে গেলাম। সেখানে সুরেশ বাবুর আগ্রা ভ্রমণের গল্প শুনে ফিরে এসে, বেলা আটটার সময় এত গরম বোধ কর্ত্তে লাগ্‌লাম যে তাড়াতাড়ি নাইতে গেলাম—এবং মনে খুব আনন্দ হোল, আরাম পেলুম—বাল্‌তির পর বাল্‌তি ঠাণ্ডা জল মাথায় দিতে লাগ্‌লাম—এত গরম!

এ সময়ে এত গরম আর কখনো কল্‌কাতায় দেখেচি বলে তো মনে হয় না।

অনেক দিন লিখি নি—বাজে জিনিস না লেখাই ভালো, অন্ততঃ এ খাতায়। আজ দুপুরটাতে কৃষ্ণধনবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম, কবিশেখর কালিদাস রায় ও দক্ষিণাবাবুর বাড়ী—সেখান থেকে এসে বারান্দাতে বসে ছিলাম, হঠাৎ মনে হোল একবার নিউ মার্কেটে গিয়ে Wide World Magazine দেখে আসি।

[illegible] ভীমেদের বাড়ীতে গেলাম, ওরা আজ নতুন খাতা কর্ত্তে বেরিয়েচে। মোড়ের মাথায় টাটি একটা মুদীর দোকানে দাঁড়িয়ে হাল খাতা করচে—তাকে ডেকে আদর করে ভারী আনন্দ পেলাম—তারপর নিউ মার্কেট ঘুরে এই মাত্র ফিরে আস্‌চি। বেজায় গরম পড়েচে আজ কল্‌কাতায়।

জীবনের সৌন্দর্য্যের কথাই শুধু আজ ক'দিন ধরে ভাব্‌চি। কি জানি কেন শুধুই মনে পড়্‌চে ছেলেবেলায় যে টক্ এঁচড়ের চচ্চড়ী ও টক্ কলায়ের ডাল দিয়ে ভাত খেতুম রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে—সেই কথা। সেই মুচুকুন্দ চাঁপার গন্ধের কথা। জীবনটার কথা ভাবলেই আনন্দে মুগ্ধ হতে হয়। এত বিচিত্র অনুভূতি, এত পরিবর্ত্তন, এত রস, এত যাওয়া-আসা—ভেবে অবাক্ হয়ে যাই।

সঙ্গে সঙ্গে এই মাত্র ক্যাম্বেল স্কুলটার সাম্‌নে যেতে যেতে মনে হোল, মানুষ অনন্তের সন্তান—একথা মিথ্যা নয়, কে বলে মিথ্যা!...সমগ্র নক্ষত্র জগতের জীবন—জরাহীন, মৃত্যুহীন, অপরাজেয় জীবন-ধারা তার নিজস্ব। সকল নক্ষত্রের পাশের দেশে—ওই যে নক্ষত্রটা আমার বারান্দার ওপর মিটিমিটি জ্বল্‌চে—ওদের চারিপাশে আমাদের মত গ্রহরাজি আছে হয় তো—তাতেও জীব আছে, অন্য বিবর্ত্তনের প্রাণী হোলেও তাদেরও সুখ-দুঃখ, শিল্প, অনুভূতি, মৃত্যু, প্রেম সবই আছে—দূরের নীহারিকা, Globular

Cluster-দের জগৎ, সে সব তো আলাদা বিশ্ব, তাতে তো অপূর্ব্ব অজ্ঞাত সব জীবন-ধারা—আমার জীবনও তো, কত দূর পথ চেয়ে কত অনন্ত সৌন্দর্য্যস্তম্ভের মধ্যে দিয়ে কাটবে তা কে জানে ?…

এই বড় জীবনটা আমার…

মানুষের মনে এই জ্ঞানটা শুধু পৌছে দিতে হবে যে, সে ছোট নয়, সে বড়, সে অনন্ত। যদি যুগে যুগে আসি যাই তা হোলেও ত ওরকম কত কালবৈশাখী, কত মুচুকুন্দ চাঁপার গন্ধ, কত টক্ কলায়ের ডাল আমার হবে।

কিন্তু প্রকৃতির নিরাবরণ মুক্ত রূপের স্পর্শে এই অনুভূতি খোলে। সুপ্ত আত্মা জাগ্রত হয় চৈত্র দুপুরের অলস নিম ফুলের গন্ধে, জ্যোৎস্না-ভরা-মাঠে, আকন্দ ফুলের বনে, পাখীর বেলা-যাওয়া উদাস গানে, মাঠের দূর পারে সূর্য্যাস্তের ছবিতে, ঝরা পাতার রাশির সোঁদা সোঁদা শুক্‌না শুক্‌না সুবাসে। প্রকৃতি তাই আমার বড় বিশল্যকরণী—মৃত, মূর্চ্ছিত চেতনাকে জাগ্রত কর্ত্তে অত বড় ঔষধ আর নাই।

আইনষ্টাইন্ বলেচেন—বিস্মিত হবার ক্ষমতা একটা বড় ক্ষমতা; যে কোনো কিছু দেখে বিস্মিত হয় না, মুগ্ধ হয় না, সে মৃত সে বেঁচে নেই। আমাদের দেশের কেউ এ কথা বুঝবেন কি ?

এই জন্যেই অল্প বয়সে আমাদের দেশে জীবনের ব্যবসায় দেউলে হয়ে পড়ে—নতুন বিস্ময়, নতুন অনুভূতি হয় না, নবতর জীবনের পথ চিরগুপ্ত রয়ে যায় তাদের কাছে—মানুষ দমে যায় জানি—কিছুকাল তার মনে সব শক্তি হয় তো ক্ষীণতর হতে পারে মানি—কিন্তু জীবন্ত যে মানুষ, সে আবার জেগে উঠবে, সে আবার নবতর বংশীধ্বনি শুন্‌বে—নব জীবনের সন্ধান পাবে। অপরাজিত প্রাণ-ধারার কোন্ অদৃশ্য উৎসমুখ তার আবার খুলে যাবে, বিজয় ও বিমৃত্য-আনন্দ তার চিরশ্যামল মনে আবার আসন পাত্‌বে। বিহার অঞ্চলে দেখেছি শীতের শেষে বনে আগুন দেয়, সব ঘাস একেবারে পুড়িয়ে ফেলে—কি জন্যে ? যাই জ্যৈষ্ঠের রৌদ্র পড়্‌বে—ওই দগ্ধ ঝোপ-ঝাপের গোড়া থেকে আবার নবীন, শ্যামল, সুকুমার তৃণরাজি উচ্ছ্বসিত প্রাণ-প্রাচুর্য্যে বেড়ে উঠতে থাকবে—হু হু করে বাড়ে, পনেরো দিনের মধ্যে সারা কালো গোটা ঘাসের বন ঘন শ্যামশ্রী ধরে—এই তো জীবন, এই তো অমরতা।

তাই ভাবি মাস, বছর ধরে মানুষের বয়স ঠিক করা কত ভুল। ১৩৩৮ সাল পড়ে গেল আজ, আমার বয়স এক বৎসর বেড়ে গেল বটে হিসেব

মত—কিন্তু আমি কি দশ বৎসর কিম্বা পনেরো বছর আগেকার সেই বালক নেই অল্পবিস্তর?…

সেদিন গেছ্‌লাম রাজপুরে অনেক কাল পরে। খিন্নুর সঙ্গে দেখা হোল। আবার পুরোনো পুকুরের পথটা ধরে হাঁটলাম—বাঁশগুলো নীচু হয়ে পড়ে আছে—চড়কের সন্ন্যাসীর দল বাড়ী বাড়ী বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। দুটোর ট্রেণে ফিরে এসে সাড়ে পাঁচটায় স্কুলের মিটিং কর্ল্লুম। রনিদকে আজ তাড়ানো হোল।

পথে কোন্ জায়গায় ফুটন্ত মালতীলতার ফুলের গন্ধ, জারমলীন আফিসের কাছে—গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরের স্মৃতিটা হঠাৎ মনে পড়ল।

সেদিন বন্ধু বল্‌ছিল—বাঁকি-করিমালি। পরিচিত নাম, বাবার মুখে ছেলেবেলায় শুনেছিলাম কবে—ভুলে গেছলাম, যুগান্ত পরে যেন কথাটা আবার শুন্‌লাম বলে মনে হোল।

অনেকদিন পরে আজ রবিবারটি বেশ কাট্‌লো। শীঘ্রই গরমের ছুটী হবে, কাল রাত্রে বাইরের বারান্দায় বৃষ্টি পড়াতে বিছানা টানাটানি করে ভাল ঘুম হয় নি, উঠ্‌তে একটু বেলা হয়ে গেল। হাতমুখ ধুয়ে কলেজ স্কোয়ারের দোকানটাতে খাবার খেতে গেলুম—ওরা বেশ হালুয়া করে। তারপর গোলদীঘির মধ্যে বসে কামাতে লাগলুম একটা নাপিতের কাছে। ওদিকে অনেকগুলি গাছ, একটা গাছে সোঁদালি ফুল ফুটেচে—এমন একটা অপরূপ আনন্দ ও উত্তেজনা এল মনে ফুটন্ত ফুলেভরা গাছটা দেখে—মনে হোল আর বেশী দেরি নেই, এক সপ্তাহ পরে ঐ রকম ফুলেভরা বন-মাঠে গিয়ে 'অপরাজিত'-র শেষ অধ্যায়টা লিখবো—সত্যি জীবনে দেখেচি ভবিষ্যতের ভাবনায় সবসময়ই এত আনন্দ পাই! ফিরে এসে অনেকক্ষণ বই লিখলুম। দুপুরে একটু ঘুমুবার চেষ্টা করা গেল—ঘুম আদৌ হোল না। বেলা আড়াইটার সময় দরজায় শব্দ শুনে খুলে দেখি নীরদবাবু। তাঁর গাড়ী নীচেই দাঁড়িয়েছিল—দু'জনে উঠে একেবারে দম্‌দমায় সুশীলবাবুর বাগানে। সত্যি, ওদের সাহচর্য্য এত সুন্দর লাগে আমার—সত্যিকার প্রাণবন্ত সজীব মন ওদের। সেখানে বাইরের মাঠে চেয়ার পেতে বসে নানা বিষয়ের আলোচনা হোল—চা-পান সমাপন হোল। শান্তিনিকেতন থেকে অমিয় চক্রবর্ত্তী 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে লিখেচেন, 'বই পড়ে গ্রামখানি

দেখতে ইচ্ছা হয়'—আর লিখেচেন, 'শিল্পীর সৃষ্ট গ্রামখানি শাশ্বতকালের, জানিনা ভৌগোলিক গ্রামখানা কি রকম দেখবো।'

ছ'টার সময় নীরদবাবুর গাড়ী করে ফিরলুম—কারণ রবিবাসর ছিল প্রেমোৎপলবাবুর বাড়ীতে। আজ খুব মেঘ করেচে, দমদমা থেকে আসতে মেঘান্ধকার পূব-আকাশের দিকে চেয়ে আমার পুরানো ভিটা ও বাঁশবনের কথা, মায়ের কড়াখানার কথা ভাবছিলুম—কি অদ্ভুত প্রেরণাই দিয়েচে এরা জীবনে—সত্যি !···নীরদবাবুও গাড়ীতে বল্লেন, কড়াখানার দৃশ্য তাঁকে সেদিন একটা অদ্ভুত উত্তেজনা ও অনুভূতি এনে দিয়েছিল মনে—গত রবিবারে সেদিন যখন ওঁরা ওখানে গিয়েছিলেন। তারপর এলুম রবিবাসরে, ওখানে তখন প্রবন্ধ পাঠ শেষ হয়ে গিয়েচে—তরমুজের আইস্-ক্রিম ও খাবার খুব খাওয়া গেল। অতুলবাবুর কাছে একটা Spiritual Circle-এর ঠিকানা নিলুম। নীরদ আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত এল—অশোকবাবু ও সজনীবাবুদের সম্বন্ধে নানা কথা। সুধাংশুবাবুর সঙ্গে দেখা হোল, তিনি যাচ্চেন সুবোধবাবুর পিতৃ-শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে। বাড়ী চলে এলুম।

আজ ভাবচি, গ্রাম সম্বন্ধে একটা সত্যকার ভালবাসা ও টান ছিল শৈশব থেকে আমার মনে। কি চোখেই দেখেছিলুম বারাকপুরটাকে—যখন প্রথম মামার বাড়ী থেকে অনেককাল পরে দেশে ফিরি, পিসিমা ওইদিকের বাঁশ-বাগান দিয়ে আসেন। কাল তাই যখন শাঁখারীটোলার দখল-করা বাড়ীটার সামনে পুরানো জমিদারী কাগজের মধ্যে ১৩১০ সালের একখানা পুরানো চিঠি কুড়িয়ে পেলাম, তখনি মনে হোল,—আচ্ছা এম্নি দিনে দশ বৎসরের ক্ষুদ্র বালক আমি কি করছিলাম! মনে একটা thrill হলো, একটু নেশামত যেন! ···কোনো সত্যিকার জিনিস মিথ্যে হয় না—সেই বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীটের মধ্যে দিয়ে আজ দুপুরে নীরদবাবুর গাড়ী করে গেলাম, যে বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীটের বাড়ীতে একদিন কত কষ্টে কালযাপন করেচি!···ওখানেই কষ্ট পেয়েচি, ওখানেই ভগবান সুখ দিলেন। সত্যিকার অনুভূতি অমর, তা বৃথা যায় না—আমার শৈশব-মনের সে জীবন্ত, প্রাণবান্ ভালবাসা গ্রামের প্রতিটি বাঁশের-খোলা ও গাবগাছটাকে অতি নিকট আপনার জন বলে ভাববার অনুভূতি ছিল সত্যিকার জিনিস—তাই আজ বহু সমঝদার মনে, সে অনুভূতিটুকু সঞ্চার কর্ত্তে কৃতকার্য্য হয়েচি। সাহিত্য-সৃষ্টি মেকী জিনিস নয়, তার পিছনে যখন সত্যিকার প্রেরণা না থাকে, একটা বড় অনুভূতি বা দৃষ্টি বা ভালবাসা না

থাকে—সেটা কখনোই বড় সাহিত্য হয়ে উঠ্‌তে পারে না—খুব কলাকৌশল হয়তো দেখানো চল্‌তে পারে, খুব cleverness-এর পাঁয়তারা ভাঁজা যেতে পারে হয়তো, কিন্তু তা সত্যিকার বড় জিনিস হয়ে উঠ্‌তে পারে না কোনো কালেও।

চারিধারে মেঘান্ধকার আকাশের কি শোভাটা আজ রাত্রে।…ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্চে—আমার বহু বাল্যদিনের অনুভূতি মনে আস্‌চে—I am relieving my childhood days—কোন্ দিনটার কথা মনে আস্‌চে আজ? …যেদিন বাবার সঙ্গে তম্‌রেজ ও আমি দক্ষিণ মাঠের চাটুয্যেদের জমি মাপ্‌তে যাই, প্রথম দক্ষিণ মাঠ দেখ্‌লাম—কত কুশবন, খোলা মাঠ, আকন্দ গাছ, সেই একদিন আর যেদিন আতরালি কালীদের গরুর লেজ কেটে দিয়েছিল, চণ্ডীমণ্ডপে তার বিচার হোল—এই দু'টি দিন।

আজ দুপুরে হরিনাভি স্কুলের ছাত্ররা এসেছিল। একখানা বই দিলাম, নিয়ে গেল।

এইমাত্র ভয়ানক দু'ঘণ্টাব্যাপী ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেল—এ বছরে এই প্রথম বৃষ্টি—সাম্‌নের রাস্তায় এক হাঁটু জল জমেচে—একটা পাগল কি চীৎকার করে বল্‌তে বল্‌তে যাচ্ছে।

এখনও একটু একটু বৃষ্টি হচ্চে—আর জোর বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্চে—মোটরগুলো জল ভেঙে যাচ্চে—কি শব্দটা! রবিবাসরে যে বেলফুলের মালাটা দিয়েচে—তার সুন্দর গন্ধ বেরুচ্চে। রাত এগারটা।

আজ রাত্রে ঘুমুতে ইচ্ছে হচ্ছে না—একটা উত্তেজনা, একটা অপূর্ব্ব অনুভূতির আনন্দ। অনেকদিন পরে মনে পড়ে একটা কথা। বাবা আড়ংঘাটা থেকে ঘোর জ্বরে অভিভূত হয়ে বাড়ী ফিরে দাওয়ায় উঠেই প্রথম কথা বলেছিলেন—খোকা কৈ, খোকা—? অথচ তিনি জানতেন আমি বোর্ডিং-এ আছি। সেই অসুখ থেকে আর তিনি ওঠেন নি। জীবনের সেই প্রথম শোক। সে কি অপূর্ব্ব অনুভূতির দিনগুলো—তার কি তুলনা আছে? হাজার বছর বাঁচলেও কি সে সব দিনের কথা ভুল্‌বো কখনও!…

এই দীর্ঘ ষোল বছরের মধ্যে মাঝে মাঝে কথাটা মনে পড়েই কি অদ্ভুত আনন্দ ও প্রেরণা পেয়েচি!

বাইরের অন্ধকার আকাশটার দিকে চেয়ে ফিরে দাঁড়ালাম। কি অদ্ভুত যে মনে হচ্চিল! ঘন ঘন বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্চে, কোন্ মহাশক্তির বিরাট কম্বুক-

ক্রীড়া যেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তার প্রাণীদলের উত্থান পতনে—যুগ-যুগান্তর ধরে প্রাণীদল তাদের অতি সত্যকার হাসি-অশ্রু সুখ-দুঃখ ধরে, কোথায় ভেসে চলে গিয়েচে—ওপরে সব সময় লক্ষ্য বৎসর ধরে এই মহাশক্তিটী তার বিদ্যুৎ, চৌম্বকশক্তি, জানা আজানা কত শক্তি নিয়ে কোন্ কাজ কর্চ্চেন তা বুঝ্‌তেও পারচি নে আমরা। মোটে তো পঁয়ত্রিশ বছর এই ব্যাপার দেখ্‌চি—তাও না, জ্ঞান হয়েচে আজ ছাব্বিশ-সাতাশ বছর। লক্ষ বৎসরের তুলনায় সাতাশ বছর কতটুকু?···সত্যিই এমন সব জীব আছেন, যাদের তুলনায় এই পঁয়ত্রিশ বছরের আমি—আমার সৃষ্ট বালক অপুর মতই অবোধ, অসহায়, কৃপা ও করুণার পাত্র—নিতান্ত শিশু। কি জানি, কি বুঝি?···কত আবোল তাবোল ভাবি, কোনোটাই হয়তো সত্যি নয় তার।

সত্যি কি অপূর্ব্ব বৈকাল!···আজ অনেকদিন পরে দেশে ফিরেচি। এই দশ-বারো দিন বৃষ্টির জন্যে আর সুবিধা কর্ত্তে পারি নি। আজ একেবারে মেঘনির্ম্মুক্ত, অদ্ভুত বৈকালটী। কাল খিনুর বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম, জ্যোৎস্না-রাত্রে পদ্ম-ফোটা লওদার বিলের ধার দিয়ে বাড়ী ফিরি—ফির্ত্তে দেরী হয়ে গেল। আজ তাই দুপুরে খুব ঘুমিয়েছি। উঠে দেখি বেলা গিয়েচে। সত্যি, এ অপূর্ব্ব দেশ···এ ধরণের অনুভূতি, গহন-গভীর, উদাস, বিষাদমাখা, আমি কোথাও কখনো দেখেচি মনে হয় না—এ সত্যিই Land of Lotus Eaters. এত ছায়া, এত পাখীর গান, এত ডাঁসা খেজুরের সুগন্ধ, এত অতীত স্মৃতি—বেদনা মধুর ও করুণ, আর কোথায় পেয়েচি কবে?···শরীর অবশ হয়ে যায়, মন অবশ হয়ে যায় অনুভূতির গভীরতায়, প্রাচুর্য্যে।

এই আমাদের ভিটাটাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম··এক টুক্‌রা রেশমী সবুজ চুড়ির টুক্‌রা চোখে পড়্‌ল—কার? হয়তো মনির। মনে হোল মায়ের স্মৃতি ভিটার সঙ্গে যেন মাখা। মা এই বৈকালে ঘাট থেকে পা ধুয়ে ফর্সা কাপড় পরে এসে আমাদের খাবার দিচ্চেন—এই ছবিই বার বার মনে আসে। আজ সব জঙ্গল, নিবিড় বনভূমি হয়ে পড়ে আছে! মায়ের সেই সজ্‌নে গাছটা আছে, সেই কড়াটা—আশ্চর্য্য, পাচীলের সেই কুলুঙ্গি দুটো চমৎকার আছে, এখনও নতুন।

ভেবেছিলাম এখনি কুঠীর মাঠে যাবো। গিয়ে কি করবো? অনুভূতি কি

এখানেই কিছু কম রে, আবার সেখানে যাবো? একদিনে কত সঞ্চয় করি, মনে স্থান দিই কোথায়!…

বকুলগাছে পাখী ডাকচে—বৌ-কথা-ক', বৌ-কথা-ক',—অমূল্য জামগাছে উঠে জাম পাড়ছিল—বুড়ী পিসীমা বল্লে, সে চারটী জাম দিয়ে গেল, তাই এখন খাবো। আজ আবার গোপালনগরের দলের যাত্রা হবে, এখন স্নান করে এসে যাত্রা শুন্‌তে যাবো।

বেলা খুব পড়ে গিয়েছে—ছায়া ধূসর হয়ে এসেচে। এমন বিকাল কোথাও দেখি নি। আজ আবার ত্রয়োদশী তিথি—মেঘশূন্য সুনীল আকাশে খুব জ্যোৎস্না উঠবে।

আদাড়ি বিল্‌বিলে থেকে জল নিয়ে বাড়ী ফিরচে হরিকাকাদের বাড়ীর ওদিকের মুড়ি পথটায়।

সন্ধ্যার ঠিক আগে বাল্যে কিসের শব্দটা বেরুতো, সেই শব্দটা বেরুচ্চে। মায়ের কথাই আবার মনে হয়!

অনেক রাত্রে বায়োস্কোপ দেখে ফিরলাম—ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্চে, মেঘান্ধকার আকাশ, রাস্তায় জল জমে গিয়েচে—তার মধ্যে বাস্-খানা কেমন চলে এল! যেন এরোপ্লেন উড়ে সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাচ্চি।

বাইরের বারান্দাতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম—একটা Vision দেখ্‌লাম—এক দেবতা যেন এইরকম অন্ধকার আকাশপথে, তুষারবর্ষী-হিমশূন্যে এক হাজার আলোক-বর্ষে চলেচেন অনবরত—দূর থেকে সুদূরে তাঁর গতি। কোথায় যাবেন স্থিরতা নেই—চলেচেন, চলেচেন, অনবরত চলেচেন, হাজার বছর কেটে গেল। বিরাম বিশ্রাম নাই—Greatness of space. Undaunted travels of গ্রহদেব।

সেদিন পাঁচুগোপালের সঙ্গে ভগবতীপ্রসন্ন সেনের বাড়ী গিয়েছিলাম। ছেলেবেলাকার সে স্থানটী হয়তো আর কখনও দেখ্‌তুম না—কিন্তু আবার সেই 'পরশুরামের মাতৃহত্যা' যাত্রাটী হয়েছিল, সেটি আবার দেখ্‌লাম—যে ঘরে বসে বাবার সঙ্গে নিমন্ত্রণ খেয়েছিলাম—ভগবতীবাবু যে রোগীকে ব্যবস্থা-পত্র দিয়েছিলেন কতকাল আগে আমার নয় বছরের শৈশবে—লেখো 'রত্নগর্ভ' ব'লে, সেই কথাটীর মনে পড়ল এতকাল পরে।

সত্যিই জীবনটা অপূর্ব্ব শিল্প—কি বলে প্রকাশ করি এর গভীর

অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য্য, এর নবীনত্ব, এর চারু কমনীয়তা—আবার সেই পথটী দিয়ে ফিরে এলাম, যে পথে বাবার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যেতুম।...বিজয়রত্ন সেনের সেই বাড়ীটা আজ আটাশ বছর পরে আবার দেখ্‌লাম।

আজ সকালে উঠে স্নান সেরে রামরাজাতলা গিয়েছিলুম ননীর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে। স্থানটা আমার ভাল লাগে নি আদৌ। পল্লীর শ্রী-সৌন্দর্য্য নেই, অথচ শহরের মহনীয়তাও নেই—শহরের মধ্যে দীনতা নেই, কুশ্রীতা কম, যেদিকে চাই, বড় বড় সৌধ, বিশাল আকাশ—আর ওখানে পল্লীর অপূর্ব্ব বনসন্নিবেশ নেই, Space নেই—আছে খোলা ড্রেন, দরিদ্র মিউনিসিপ্যালিটীর তেলের আলো আর ওলকচুর বর্ষাপ্রবৃদ্ধ ঘেঁসাঘেঁসি। ননীর সঙ্গে অনেক কথা হোল। ছেলেটীর মধ্যে সত্যিই কিছু ছিল, কিন্তু গেঁয়ো হয়ে খুল্‌তে পার্চ্ছেনা। ওকে কল্‌কাতায় এনে ভাল সমাজে পরিচিত করে দেবো।

বিকেলে বাসায় ফিরলাম। কি সুন্দর আকাশ!...বৃষ্টি নেই অনেকদিন, অথচ মেঘের পাহাড় নানা স্থানে আকাশের। কেমন যে মনে হচ্ছিল, তা কি করে বলি।...বেলা পাঁচটাতে রবিবাসর ছিল প্রবাসী আফিসে। হেমেনের গানের কথা ছিল, প্রথমে অনেকক্ষণ সে এলনা। আমি, সজনী, অজিত সকলেই ব্যগ্রভাবে তার প্রতীক্ষায় ছিলাম। রবিবাসরে যাবার পথে রাধাকান্তদের মাষ্টার সুশীলবাবুর সঙ্গে দেখা।

সুশীলবাবু বিভূতির কথা উল্লেখ করে অনেক দুঃখ কর্ল্লে। সত্যিই ছেলেটা খারাপ হয়ে যাচ্চে সবাই বলে। অক্ষয়বাবুর নাকি মধ্যে একদিন ফিট্ হয়েছিল গাড়ীতে—অতিরিক্ত মদ্যপানের ফল। ওদের সম্পত্তিটা অভিশপ্ত—সংযম ও উদারতার অভাবে এবং কতকটা কুশিক্ষা ও দাম্ভিকতার ফলেও ওদের সব নষ্ট হয়ে যেতে বসেচে।

এই সব ভাবচি এমন সময় হেমেন এল, গান আরম্ভ হোল। শৈলজা বলছিল তাকে কে কে blackmail করেচে। সাহিত্যক্ষেত্রে এমন দলাদলি সত্যিই দুঃখের বিষয়। নীহারবাবু বল্লে, ওর কে একজন দাদা 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে বলেচেন, অমন বই আর হবে না। সজনী 'অপরাজিত' নিতে চাইলে। খুব খাওয়া-দাওয়া ও আড্ডা হোল। হেমেন সত্যিই বল্লে বাঙ্গালীর নিষ্ঠা ও সাধনার অভাব—সস্তা হাততালি ও নাম কিন্‌বার প্রলোভনে আমরা যেতে বসেচি।

হেমেন ও আমি নানা পুরানো কথা বল্‌তে বল্‌তে শেয়ালদ' পর্য্যন্ত

এলাম—ওকে পার্ক সার্কাসের ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে বল্লুম, পূজোর ছুটীতে লক্ষ্ণৌতে আবার দেখা হবে।

সত্যিই বড় ভালবাসি হেমেনকে।

চাঁদ ওঠেনি কিন্তু আকাশে খুব মেঘও নেই। খুব হাওয়া।

রাত দশটা—বাসার বারান্দায় বসে লিখ্‌চি। দূরের সেই মাকাল লতা দোলানো ভিটের কথা মনে পড়্‌চে—বর্ষাকালে খুব জঙ্গল বেড়েচে। আজ বৈকালটী কি অপূর্ব্ব হয়েছিল সেখানে···কেবল সেই কথা ভাবি। সেখান থেকে প্রথম জীবন শুরু করেছিলাম—কত পথে চলেচি, কত আলাপী বন্ধুর হাত ধরে—কিন্তু সে জঙ্গলে-ভরা ভিটেটা কি ভুলেচি!···

ননীকে একদিন সত্যিকার বাংলার রূপ দেখাবে।

তারপর সারা রাত আর ঘুম হোল না। এত অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নাও কল্‌কাতায় আর কখনো দেখিনি যেন—বর্ষাধৌত নির্ম্মল আকাশে সে কি পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার খেলা! সারারাতের মধ্যে আমি ঘুমুতে পারলাম না—গুন্-গুন্ করে গাচ্ছিলাম—

"প্রলয় নাচন নাচ্‌লে যখন আপন ভুলে,
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়্‌ল খুলে"

—কেমন একটা আনন্দ ও উত্তেজনা এল—সারারাতের মধ্যে চোখ বুজল না মোটে।

সেদিন নীরদবাবু ও সুশীলবাবুর সঙ্গে মোটরে বহুকাল পরে যশোর গিয়েছিলাম—আবার স্কুলটা দেখলাম,—আবার চাঁচড়া দেখলাম। শীতের সন্ধ্যায় চাঁচড়া দশমহাবিদ্যার মন্দির দেখতে দেখতে কি অদ্ভুত ভাব যে মনে জাগ্‌ছিল—চারিধারের ঘন সবুজ বেত ঝোপ, পুরোনো মজা দীঘি—মহলের পর মহল নির্জ্জন, সঙ্গীহীন, ধূসর সান্ধ্য ছায়ায় শ্রীহীন অথচ গভীর রহস্যময় পাথর-পুরীর মত দেখাচ্ছিল। পেছনের ঘাট-বাঁধানো প্রকাণ্ড দীঘিটাই বা কি অদ্ভুত!···রাজা রামচন্দ্র খাঁয়ের চাল ধোয়া পুকুরই বা দেখ্‌লাম কতকাল পরে। একটা সুন্দর প্লট মাথায় এসেচে।···এই ভাঙ্গা পুরী, বনেদী ঘরের দারিদ্র্য, জীবনের দুঃখ কষ্ট—Back-ground-এ সব সময়ই পুরাতন দিনের আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য [illegible] এই সব নিয়ে।

সাধনার কথা বল্‌ছিলাম কাল কৃষ্ণধনবাবুর সঙ্গে। সাধনা চাই। আমি

টুইশানি ছেড়ে দেবো। অপরাজিত তো শেষ হয়েচে—এইবার ছাপা আরম্ভ হবে—কিন্তু এই সময় সাধনা চাই।

(১) ভাল ভাল উপন্যাসকার ও ছোট গল্প লেখকদের পুস্তক পাঠ।

(২) ইতিহাস, Biology ও Astronomy সম্বন্ধে আরও বই পড়া।

(৩) Philosophy সম্বন্ধে আধুনিক চিন্তাবীরদের বই পড়া।

(৪) Sir Thomas Browne ও Anatole France-এর বই আরও ভাল করে পড়া।

(৫) চিন্তা, ভ্রমণ, গল্প ও আড্ডা—ভাল সম্প্রদায়ে।

(৬) পল্লীতে যাওয়া ও Quaint ধরণের লোকের সঙ্গে আলাপ।

সাধনা ভিন্ন উচ্চ Outlook কি করে develop করে? খানিকটা মাত্র আমার করেচে—আরও চাই—আরও অনেক চাই।

১৯২৫ সালের, কি ১৯৩২ সালের আমি আর বর্ত্তমান আমি কি এক? অনেক বেড়েচি—সেটা বেশ বুঝতে পারি—এই দুঃখ, খাটুনি, কম মাইনে, ছেলে-পড়ানোর মধ্যে দিয়েও বেড়ে উঠ্‌চি। মানুষ কখন কি ভাবে কোন্ অবস্থার মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠে—তা কেউ জানে না।

ক'টা দিন বেশ কাট্‌ল। সেদিন হাওড়ায় রায় সাহেব সুরেশ সেনের ওখানে একটা পার্টি ছিল। সুশীলবাবু আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে গেলেন—রমেশবাবু, নীরদবাবু সবাই সেখানে। তারপর জ্যোৎস্না-রাত্রে গঙ্গার উপর দিয়ে ফেরা গেল। শনিবারে সকালে সকালে কাজ মিট্‌তো, সাহেব এক গোলমাল পাকিয়ে দিলে—বল্লে, তোমার নাম সিনেট থেকে যায় নি। সিণ্ডিকেটের সেদিনই মিটিং—ছুটীর পরে ফণিবাবু ও আমি দু'জনে মিলে সুনীতিবাবুর কাছে গেলাম। বাড়ীতে দেখা না পেয়ে ইউনিভার্সিটী—সেখানে দেখা হোল। তারপর আমরা কলেজ স্কোয়ারে অনেকক্ষণ বসে গল্প কর্ল্লুম। সেখান থেকে ইন্‌ষ্টিট্যুউটে রাগিণী দেবীর নৃত্যকলা সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে গেলাম। ফণিবাবু আমাকে Y. M. C. A.-এর সামনে ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে গেল। আমি X. Libaryতে যাবো। সেখানে সজনীবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রয়োজন। যাওয়ার সময় তাকে সেখানে না দেখে সোজা শনিবারের চিঠি আফিসে চলে গেলাম। সেখানে নেই, আবার এলাম ফিরে, আজ নাকি হরতাল—কেউ আসে নি। ওখান থেকে বাস্-এ চেপে

শ্যামাপ্রসাদ বাবুর কাছে ভবানীপুরে। শ্যামাপ্রসাদ বাবুর সঙ্গে দেখা করেই মুরলীবাবুর বাড়ী। তার পরে অনেক রাত্রে ট্রামে বাসা।

পরদিন ছুটীর পরে স্থনীতিবাবুর সঙ্গে engagement. সকালে সজনীর ওখানে গেলাম। লুচি ও চা সজনীর স্ত্রী যত্ন করে খাওয়ালেন। সেখান থেকে দু'জনে শনিবারের চিঠির আফিস—আমি খানিকক্ষণ প্রুফ দেখে স্কুলে এলাম ও ছুটীর পরে ইউনিভার্সিটীতে গেলাম। প্রথমে এসিষ্ট্যাণ্ট কণ্ট্রোলের আফিসে কেউ নেই—পরে দেখি সাহেব রেজিষ্ট্রারের ঘরের সাম্নে দাঁড়িয়ে আছে। আমিও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কর্ল্ুম, একটু পরেই সাহেব বেরিয়ে এল। অনেকক্ষণ দু'জনে গল্প করা গেল। তারপর হেড়ম্ববাবু, ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেব, মিঃ বটস্লি, একে একে সবাই এলেন। পাঁচটার পরে আমি ওখান থেকে ফিরে সোজা শনিবারের চিঠির আফিসে। গোপাল হালদারের সঙ্গে Spiritualism নিয়ে সেখানে ঘোর তর্ক। স্থনীতিবাবু এলেন—গল্পগুজবের পরে আমি, স্থনীতিবাবু ও প্রমথবাবু তিনজনে গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে বেরুনো গেল।

স্থনীতিবাবু 'পথের পাঁচালী' ইংরাজিতে অনুবাদ করবেন এমন ইচ্ছা প্রকাশ কর্ল্লেন। প্রমথবাবু ইটালিয়ানের প্রোফেসর ইউনিভার্সিটীতে, তিনি আমার সঙ্গে বাড়ী এলেন। আমার বইখানা ইটালিয়ানে অনুবাদ সম্বন্ধে অনেক কথা হোল। ইটালিতে আমায় পাঠানো সম্বন্ধে বল্লেন। তিনজন ভদ্রলোক এসে দেখি বাসায় আছেন—তাঁরা কালকের একটা পার্টিতে নিমন্ত্রণ কর্ত্তে এসেচেন।

সকালে উঠে স্কুলে গেলাম ও শনিবার সকালে ছুটীর পরেই বাসায় এলাম। অনেকক্ষণ ঘুমুবার চেষ্টা করা গেল। আন্দাজ চারটার সময় উঠে হ্যারিসন রোড দিয়ে যাচ্ছি—শীতল পেছন থেকে ডাক্লে ও একখানা পত্র দিলে। একটা সভা আছে ওদের বাড়ী—আমি সভাপতি। প্রথমে গেলাম হেঁটে শনিবারের চিঠির আফিসে—সেখানে Copy দিয়ে সোজা হাঁটতে হাঁটতে (খুকীকে যে পথ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছলাম সেই পথটা ধরে) বিডন্ স্কোয়ার। সেখানে একটা বেঞ্চির উপর বসে কত কথা ভাবলাম। মায়ের পোঁতা সেই সজনে গাছটার কথা এত যে মনে হয় কেন? মনে হোল, যে জীবনটায় আর কখনো ফিরবো না—যা শেষ হয়ে গিয়েচে ওই

সজ্‌নে গাছটা এখনও কার ফিরবার আসায় সেই দিনগুলির মত পাতা ছাড়চে, ফুল ফোটাচ্চে—ডাঁটা ফলাচ্চে—কে এসে ভোগ করবে? সন্ধ্যার ধূসর আকাশ—দু' চারটা তারা—'জনতার মাঝে জনগণ পতি' গানটাও আবার মনে এল—আকাশের তারাদের দিকে চাইলেই ওই অপূর্ব্ব ভাবটা হয়।

তারপর উঠে ওদের বাড়ী গেলাম। মন্মথদের বাড়ী সভা হোল। আমায় কর্ল্লে সেক্রেটারী। সভা ভঙ্গের পরে বিভূতি গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে, এখানে রাত্রে খেয়ে যাবেন। তারপরে লাল ঘরে অনেকক্ষণ আড্ডা হোল। পড়বার ঘরে তারপরে বিভূতি কাছে বসে খাওয়ালে। পুরোনো দিনের গল্প হোল, সব চেয়ে কথা উঠ্‌ল—'পুত্তলিকা' 'পুত্তলিকা' সে কথা হোল। তারপর রিক্সা করে মাঘী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-রাত্রে পুরানো দিনের মত বাসায় ফিরলাম—সেই প্রতাপ ঘোষের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে, খানাটার পাশ দিয়ে। একটা কথা লিখ্‌তে ভুলে গিয়েচি, আজ বিকালে প্রবাসী আফিসে Sir P. C. Ray-এর সঙ্গেও দেখা করেছিলাম।

রবিবারে প্রসাদ এল। বেশ মাথায় বড় হয়েচে—সেই ছোট্ট প্রসাদ আর নেই। তাকে দেখে এমন স্নেহ একটা হোল! আমার নাম উঠ্‌লেই এখনও সকলে কাঁদে—চাঁপাপুকুরের বড় মাসীমা কাঁদেন, এই সব কথাও বল্লে। একটা চাকুরীর কথা বল্লে। তারপর আমার নাম এখন প্রায়ই সকলে করেন সে কথাও বল্লে। তারপর সে চলে গেল।

আমি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েচি, নীরদবাবু এসে ডাকচেন। দু'জনে দম্‌দমা গেলাম—সুশীলবাবু শান্তিকে পড়াচ্ছিলেন—দু'জনেই বাইরে এলেন। গল্পগুজব হোল—মাঠে বসে চা খাওয়া গেল। আমরা পাঁচটার সময়ে বেরিয়ে শরদিন্দু বাবু ও করুণাবাবুর পার্টিতে এলাম। নরেন দেব, অচিন্ত্য, প্রবোধ সান্ন্যাল, রমেশ বসু—সবাই এল। খুব খাওয়া-দাওয়া হোল। প্রচুর খাওয়া! নরেন দেব সন্দেশ খেতে খেতে মুখ লাল করে ফেলে অবশেষে যখন আরও খেতে অনুরুদ্ধ হলেন—মরিয়া হয়ে বল্লেন সন্দেশটা ভালো নয়। আমরা বেরিয়ে শেয়ালদা' ষ্টেশনে এসে সুশীলবাবুকে তুলে দিয়ে নীরদবাবুর গাড়ীতে নিউ মার্কেটে গেলাম। কথা রৈল বৃহস্পতিবারে 'অপরাজিত' পড়া হবে দম্‌দমার বাগান-বাড়ীতে। Wide World কিনে রাতে বাসায় ফিরলাম। কিন্তু

আজই মনটা কেমন উড়ু উড়ু, মায়ের সেই সজ্‌নে গাছটা,—ভাঙা হাঁড়িকুড়ীর কথা আজ সারাটা দিন মনে হয়েছে—বিশেষ করে এই জ্যোৎস্না-রাত্রে।

এবার সরস্বতী পূজা একটু দেরিতে। কিন্তু ছুটী পাওয়া গেল বেশী। সপ্তাহব্যাপী ছুটী। 'অপরাজিত' প্রায় শেষ হয়ে আস্‌চে—ভাবলাম একবার কেওটা যাবো এসময়ে। নীরদবাবুও রাজী। গত মঙ্গলবার আমি ও নীরদবাবু মোটরে গেলাম দম্‌দমা। স্থশীলবাবু যেতে পারবেন না, অতএব আমরা সেখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে দক্ষিণেশ্বর যাবো বলে বেরিয়ে পড়ি। স্থশীলবাবুর স্ত্রীও 'অপরাজিত' শুন্‌বেন বলে দক্ষিণেশ্বর যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। সবাই বেরিয়ে পড়া গেল কিন্তু দক্ষিণেশ্বর যাওয়া হোল না। যশোর রোডের 'পরে একটা নিভৃত বাঁশবনের ছায়ায় বিছানা পেতে বসে আমরা 'অপরাজিত' পড়লাম—তারপর ফিরে এসে চা খেয়ে আড্ডা দেওয়া গেল। রাত্রে রমেশবাবুর ওখানে নেমন্তন্ন ছিল—সেখানে প্রবোধ সান্ন্যালের সঙ্গে দেখা।

বুধবার দিনটী কাজ করলাম। বৃহস্পতিবার সকালে বনগ্রামের ট্রেণে চাপ্‌লাম—বন্ধুদের বাসায় পৌঁছে দেখি তরু নেই। হেড্‌পণ্ডিতকে নিয়ে গিয়ে স্কুলে অঞ্জলি দিলাম। দেবেনের বাসায় গেলাম, তারপর ফিরে এসে তরুর সঙ্গে গল্প-গুজব করে চাল্‌কী রওনা।

কি অদ্ভুত আমের বউলের সৌরভ, কি শিমূলফুলের শোভা। বাতাবী লেবুফুলের গন্ধ। কাল পয়লা ফাল্গুন, এমন বসন্তশোভা আমাদের দেশে অনেককাল দেখি নি। চাল্‌কী পৌঁছে খাবার খেয়ে খুকী, ভোঁদো সবশুদ্ধ উত্তরমাঠে বেড়াতে গেলাম—রস খাওয়া গেল—অনেকটা বেড়ালাম। তারপর ওদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আমি আবার গেলাম উত্তর মাঠে—তখন চারিধার কি নির্জ্জন!

পরদিন সকালে উঠে বারাকপুরে গেলাম। সারা পথে কেমন দক্ষিণা হাওয়া—কি অপূর্ব্ব আমের বউলের গন্ধ! খুকীও সঙ্গে গেল। সকাল সকাল ফিরে স্নান করলাম। তারপর বৈকালে বেরুতে যাবো, বৃষ্টি এল—একটু বস্‌লাম। আবার যাবো—রামপদ এল। তাকে একটু জল খাইয়ে দু'জনে একসঙ্গে বার হওয়া গেল। কি অপূর্ব্ব শান্তির মধ্য দিয়ে এসে পৌঁছলাম। আমি পটুপটি তলায় ঘাটের এপারে এসে দাঁড়ালাম—ওপারের

রাঙা-রোদভরা মাঠের দৃশ্যটা কি যে অপরূপ! তারপর মাঠের পথ বেয়ে আমাদের বাড়ীর পিছনের পথে আস্‌চি, বেলা পড়ে এসেচে—কি বাঁশের শুক্‌নো খোসা ও ঝরা বাঁশপাতার সুঘ্রাণ!…কতকাল আগের শৈশবের কথা মনে করিয়ে দেয় যে।

রামপদর কাছে বসে একটু তামাক খেয়ে ও গল্পগুজব করে শ্যামাচরণ দাদার বাড়ী এলাম। সেখানে অপেক্ষা করলাম। জ্যোৎস্না উঠ্‌লে চাল্‌কী চলে এলাম। ছেলেপিলেরা এল গল্প শুন্‌বে বলে। বঙ্কু অনেকক্ষণ ছিল।

আজ সকালে উঠে চলে এলুম।

কাল বিকালে সুশীলবাবুদের বাড়ী গেলাম। কি সুন্দর বসন্ত এবার এখানে! বৃষ্টি নেই। দেশে গিয়েছিলাম—সর্ব্বত্র আমের বউলের গন্ধ। আজ সকালে সজনীর বাড়ী গেলাম—স্নান সেরে। বেজায় কুয়াসা। সজনীর স্ত্রী চা ও লুচি খাওয়ালেন। বড় ভাল মেয়েটী।

'অপরাজিত'-র শেষ লেখাটা আজ প্রেসে দিয়ে এসেচি। কিছু করবার নেই। হাত ও মন একেবারে খালি। স্কুল থেকে ফিরে নিউ মার্কেটে গিয়ে "Wide World" খুঁজে পেলাম না। হাঁটতে হাঁটতে কলেজ ষ্ট্রীটে এসে কাপড় কিনে এই ফির্‌চি।

'অপরাজিত'র শেষটা ভাল করে দেখ্‌বার জন্যে তিনদিন ছুটী নিয়েছিলাম। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম—ছুটী ভাল লাগে না। স্কুলটাই ভাল লাগে। বেশ ছেলেপুলে নিয়ে থাকা—অমিয়, দেবব্রত, বিমলেন্দু সত্যব্রত এদের সঙ্গে বেশ লাগে। ওরা সবাই শিশু—নীচু ক্লাশের ছেলে। আমাকে মাষ্টার বলে ভয় তত করে না, যতটা আপনার লোকের মত ভালবাসে। সব বিষয়ে সাহায্য চায়, troubles খুলে বলে, বেশ লাগে। ওদের নিয়ে সময়টা যে কোথা দিয়ে কেটে যায়, টেরই পাই না। নিষ্ক্রীয়, Death-in-Life ধরণের existence-এর চেয়ে এরকম স্কুল মাষ্টারীও শতগুণেও শ্রেয়।

আজ একটা স্মরণীয় দিন। আজ সকালে উটে সজনী দাসের বাড়ীতে চলে গেলাম, না খেয়েই—সে এ কয়দিনই অবশ্য যাচ্ছি। কিন্তু আজ গেলাম 'অপরাজিত'র শেষ ফর্ম্মার প্রুফ্ দেখবার জন্যে। ওখান থেকে স্কুলে। সেখানে দেবব্রতের পরীক্ষা নিলাম। তারপর ইউনিভার্সিটীর

সামনে সুধীরদা'র সঙ্গে দেখা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাদের স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে দেখা হোল—সমীর বল্লে ভালো লিখেচে। শৈলেন বাবুর সঙ্গেও দেখা হোল। তারপর এক কাপ চা খেয়ে আবার গেলাম সজনী দাসের ওখানে। প্রথমবাবু ও সজনী বসে। শেষ ফর্ম্মাটা প্রেসে ছাপ্‌তে দিয়েচি। তারপরে কি করে 'পথের পাঁচালী' প্রথম মাথায় এল, সে গল্প করলাম।

আজ তাই মনে হচ্চে, সত্যই স্মরণীয় দিনটা। ১৯২৪ সালের পূজার সময়টা থেকে এপর্য্যন্ত প্রায় সব সময়ই এই বই-এর কথাই ভেবেচি। ১৯২৬ সাল থেকে শুরু করে ১৯৩২-এর ১০ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত এমন একটা দিনও যায় নি, যখন আমি এ বইখানির কথা না ভেবেচি—বিভিন্ন চরিত্র, বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন মনোভাব নোট্‌ করেচি, মনে রেখেচি—কত কি করেচি। ইস্‌মাইলপুরের জঙ্গলে এমন কত শীতের গভীর অন্ধকার রাত্রি, ভাগলপুরের বড় বাসায় এমন কত আমের বউলের গন্ধ-ভরা ফাগুন দুপুর, কত চৈত্র বৈশাখের নিমফুলের গন্ধ-মেশানো অলস অপরাহ্ণ, বড়বাসার ছাদে কত পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রাত্রি অপু, দুর্গা, পটু, সর্ব্বজয়া হরিহর, রাণুদি এদের চিন্তায় কাটিয়েচি। এরা সকলেই কল্পনাসৃষ্ট প্রাণী। অনেকে ভাবেন আমার জীবনের সঙ্গে বুঝি বই দু'খানির খুব যোগ আছে—চরিত্রগুলি বোধ হয় জীবন থেকে নেওয়া। অবশ্য কতকটা যে আমার জীবনের সংযোগ আছে ঘটনাগুলির সঙ্গে, এবিষয়ে ভুল নেই—কিন্তু সে যোগ খুব ঘনিষ্ঠ নয় —ভাসা ভাসা ধরণের। চরিত্রগুলি সবই কাল্পনিক। সর্ব্বজয়ার একটা অস্পষ্ট ভিত্তি আছে—আমার মা। কিন্তু যারা আমার মাকে জানে, তারাই জানে সর্ব্বজয়ার সবখানি আমার মা নন।

আজ রাত অনেক হলো। এদের সকলের উদ্দেশ্যে বইখানি উৎসৃষ্ট করলাম। যদি সাহিত্যের বাজারে আন্তরিকতার কোন মূল্য থাকে, তবে আমার ইসমাইলপুরে, ভাগলপুরে বড়বাসার ছাদে আমার বহু বিনিদ্র রজনী-যাপনের ইতিহাস একথায় সাক্ষ্য দেবে যে, বই দু'খানি লিখ্‌তে আন্তরিকতার অভাব আমার ছিল না বা চিন্তার আলস্য আমি দেখাই নি।

আজ সত্যিই কষ্ট হচ্চে। অপু, কাজল, দুর্গা লীলা—এরা এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরে আমার আপনার লোক হয়ে পড়েছিল। আজ ওবেলাও প্রুফ দেখেচি, অদলবদল করেচি—কিন্তু এবেলা থেকে তাদের সকলকেই সত্য-

সত্যই বিদায় দিলাম। আজ রাত্রে যে কতখানি নিঃসঙ্গ ও একাকী বোধ করচি, তার সন্ধান তিনিই জানেন, যিনি কখনো এমনি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে গুটিকতক চরিত্র সম্বন্ধে সর্ব্বদা ভেবেচেন।—তাদের সুখদুঃখ, তাদের আশা-নিরাশা, তাদের ভবিষ্যৎ দুরুদুরু বক্ষে চিন্তা করেচেন।

অপুকে জন্ম থেকে ৩৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি কলমের ডগায় সৃষ্টি করেচি। তাকে ছাড়তে সত্যিকার বেদনা অনুভব করচি—তবে সে ছিল অনেকখানিই আমার নিজের সঙ্গে জড়ানো, সেইজন্যে বেশী কষ্ট হচ্চে বিদায় দিতে কাজলকে, লীলাকে, দুর্গাকে, রাণুদি'কে—এরা সত্যসত্যই কল্পনাসৃষ্ট প্রাণী। কোনোদিকে এদের কোনো ভিত্তি নেই এক আমার কল্পনা ছাড়া।

যদি দু'পাঁচজনেরও এতটুকু ভাল লাগে বই দু'খানা—তবে আমার পাঁচ বৎসরের পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করবো।

সত্যিই মনে পড়ে ইসলামপুর থেকে সাবোরে আস্‌চি ঘোড়ায় ভাব্‌তে ভাব্‌তে—নোট্ কর্ত্তে কর্ত্তে। কার্ত্তিক আগুন জ্বাল্‌লে সাবোরে ষ্টেশনে। সে সব জিনিস আজ শেষ হোলো? যখন 'পথের পাঁচালী' ছাপা হয়েছিল, তখনও 'অপরাজিত' ছিল—বেশীটাই বাকী ছিল কিন্তু আজ আর কিছু নেই।

রাত্রি অন্ধকার। চাঁদ ডুবে গিয়েচে। শহরের গোলমাল থেমেচে। আমি লিখ্‌তে লিখ্‌তে বহু দূরের অন্ধকার আকাশের জ্বল্‌জ্বলে নক্ষত্রদের দিকে চেয়ে দেখ্‌চি—জীবনদেবতার কি ইঙ্গিত, যেন আগুনের আখরে আকাশের অন্ধকারে পটে লেখা।

বিদায়, বন্ধুদল,—বিদায়।

আজ সকালে মহিমবাবু এসে অনেকক্ষণ বসেছিল। তারপর স্কুল থেকে গেলাম ইউনিভার্সিটীতে Examiners' Meeting-এ। বেরিয়ে আমি ও সুনীতিবাবু দু'জনে গেলাম লিবার্টি আফিসে। টম্‌সন সাহেব সেদিন এলবার্ট হলের বক্তৃতায় 'পথের পাঁচালী'র উল্লেখ করেচেন—নীহার রায়ের মুখে শুনে একখানা কাগজ আনিয়ে নিলাম। তারপর বাসে উঠে সজনীর বাড়ী। সেখান থেকে ফিরে Sample কাগজখানা দেখা এইমাত্র শেষ করলাম। স্কুলে দেবব্রত খাতা দেখাতে কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে ওবেলা—তাকে বললাম তুই আমার ছেলে তো?

সে বল্লে একটু সলজ্জ হেসে—হাঁ। ও কখনো একথা বলে নি এর আগে। তাই আজ আনন্দে মনটা পূর্ণ আছে সারাদিন।

আজ রাত্রে 'অপরাজিত' বই-এর দ্বিতীয় খণ্ডটা সজনীর কাছ থেকে আন্‌লাম। আজ সকালেই বই বার হয়েছে। অনেক রাত পর্য্যন্ত বসে থেকে চা খেয়ে ও গল্প-গুজব করে চলে এলাম।

দ্বিজরাজ জানা মারা গিয়েচে বলে সকালে ছুটী হোল। বেরিয়ে আমি যতীনবাবু ও ক্ষেত্রবাবু ওয়াছেল মোল্লার দোকানে ও নিউ মার্কেটে বেড়ালাম। সেখান থেকে ইউনিভার্সিটীতে গেলাম কাগজের খোঁজে। কাগজ পেলাম না। বীরেনবাবুও ছিল। বেরিয়ে বাসায় এসে একটু ঘুমুনো গেল।

এখন রাত। সিঁদুরে মেঘ হয়েচে। মনটা কেমন একটা বিষাদে পরিপূর্ণ—মনটা শূন্য হয়ে গিয়েচে—অপু, দুর্গা, সর্ব্বজয়া, কাজল, লীলা, পটু, বিলি—এরা সব আজ মনের বাইরে চলে গিয়েচে কতকালের সহচর সহচরী সব—সেই ইসমাইলপুরে এমন সব চৈত্র অপরাহ্ণে Wide World পড়া দিনগুলো থেকে ওরা আমার মনের মধ্যে ছিল—কাল একেবারে চলে গিয়েচে।

ওদের বিরহ অতি দুঃসহ হয়ে উঠ্‌চে।

এর আগে ক'দিন মনটা ছিল নিরানন্দ। কেবল গৌরীপুরের মাঠে যেদিন Picnic কর্ত্তে যাই আমরা—সেদিনটাতে আনন্দ পেয়েছিলাম। সেই আধ-জ্যোৎস্না আধ-আঁধার রাত্রে তালবনের ধারে পুকুরপাড়ে বসে কত কি গল্প—কতকাল ওসব কথা মনে থাকবে।

কাল রাত্রে সাহিত্য-সেবক-সমিতিতে সভাপতি ছিলাম। অচিন্ত্য একটা গল্প পড়্‌লে—গল্পটা মন্দ হয় নি। সেখান থেকে বেরিয়ে অনাথ-ভাণ্ডারের থিয়েটার দেখতে যাবো কথা ছিল, কিন্তু অবনীবাবু, সুকুমার ও শৈলেন বাবুর সঙ্গে জমে গিয়ে রাত এগারোটা পর্য্যন্ত হৃষিকেশ লাহাদের বাড়ীর সামনের পার্কটাতে আড্ডা দিলাম। সেখান থেকে বা'র হয়ে বাসায় ফিরলাম অনেক রাতে।

আজ বেলা চারটার ট্রেণে শ্রীরামপুরে গেলাম। সেখানে 'আনন্দ-পরিষদের' অধিবেশনে সভাপতিত্ব কর্ত্তে হবে। ছেলেরা ওখান থেকে এসেছিল। অবনীবাবুকেও সঙ্গে নেবো বলে ডাক্‌তে গেলাম, পেলাম না। ঝম্‌-ঝম্‌ করচে দুপুরের রোদ। কিন্তু একটু পরে বেশ মেঘ করে এল। শ্রীরামপুরে শ্রীলীলারাণী [illegible] বাড়ীতে নিয়ে গেল। লীলারাণী দেবী লেখিকা, 'কল্লোল' ও 'উপাসনা'য় লেখেন। ওপারের বারান্দাতে তিনি বরফ দিয়ে সরবৎ তৈরী করে খাওয়ালেন ও জলখাবার দিলেন। তাঁর সঙ্গে সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এঁদের বাড়ীর কাছেই খুকীর শ্বশুরবাড়ী। একবার সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা ছিল। লোকও পাঠালাম —কিন্তু লোক ফিরে এসে বল্লে কারুর সঙ্গে দেখা হোল না।

সভায় যখন আস্‌চি—ওদের বাড়ীটা দেখ্‌লাম—ভাঙা দোতালা বাড়ী—একটা কয়লার গোলার পাশ দিয়ে পথ। সভার 'কার্য্য-শেষে আবার ভূরিভোজনের ব্যবস্থা। সমবেত ভদ্রলোকেরা আমাকে একটা বড়লোকের বাড়ীর দোতালার হলে নিয়ে গেলেন—সেখানেই একটা বড় শ্বেতপাথরের টেবিলে নানারকম ফলফুল, মিষ্টান্ন সরবৎ সাজানো। এত খাই কি ক'রে? এই তো শ্রীলীলারাণী দেবীর ওখান থেকে খেয়ে আস্‌চি। কে সে কথা শোনে? আনাতোল ফ্রাঁসের Procurator of Judea গল্পটী খেতে খেতে ওঁদের কাছে কল্লু্ম—রসের বৈচিত্র ও quaintness হিসেবে।

ওরা ট্রেণে তুলে দিয়ে গেল। ট্রেণে একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হোল—বাড়ী জিরেট বলাগড়, বিড়ি খাওয়ালে, অনেক গল্প-গুজব করলে। হাওড়া ষ্টেশন থেকে হেঁটে বাসায় এলাম। পথে পানিতরের বামনদাস দত্তের সঙ্গে দেখা। আজ পয়লা মে! একটা স্মরণীয় দিন। আজকার সভার জন্যে বা এসব আদরের জন্যে নয়—আজ ১৩ বৎসর হতে সেই ১লা মে'তে—কিন্তু সেকথা আমিই জানি, আর কেউ জানে না। জানবার কথাও নয়। বোল্‌বেও না কাউকেও।

বেশ হাওয়া, বাসায় এসে বারান্দায় বিছানা পেতে শুয়ে রইলাম।

আজ মনে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ পেলাম—অনেক কাল পরে। মনে পড়ে গেল বাল্যে দুপুরে আহার সেরে এই সব দিনে বাড়ীর পেছনে বাঁশবনে মুখ ধুয়ে আসতাম। বাঁশবনে গিয়ে আঁচালে তবে মনে একটা আনন্দ আসতো—কত তুচ্ছ জিনিস, কিন্তু একদিন ও থেকে কি গভীর

আনন্দই পেয়েচি!···সেই ভিটে, সেই গ্রাম আজও তেমনি আছে—আমিই কেবল বদলে গিয়েচি। আজ রবিবার ফণিকাকারা তাড়াতাড়ি করচে এত রাত্রে হরি রায়ের বাড়ীতে তাস খেলতে যাবে বলে—ঝীট্‌কীপোতার বাঁওড়ে বড় রুই মাছের বাচ্ হচ্চে বলে—হাটে আজ মাছ সস্তা হয়েচে বলে—আমিও যদি গ্রামে থাক্‌তুম—আমিও ও থেকে আনন্দ পেতুম ওদেরই মতন—কিন্তু আমি বদ্‌লে গিয়েচি একেবারেই। Sophisticated হয়ে পড়েচি, hampered হচ্চি। দৃষ্টির স্বচ্ছতা নষ্ট হয় নি বলে এখনও এ সব বুঝতে পারি।

আকাশের অগণ্য তারায় কত দেবলোক, কত পৃথিবী, কত জগৎ—কত অগণিত প্রাণীকুল, কত দেবশিশু—আনন্দের কি মহান, অসীম ভাণ্ডার! দুঃখও যত বৃহৎ তাদের—আনন্দও তত বৃহৎ। এই ভেবেই, চৈতন্যের এ প্রসারতা শুধু আমার আজ রাত্রে।

আজ সকালে উঠ্‌তে দেরি হয়ে গিয়েছিল, কারণ কাল অনেক রাত্রে দমদম্ থেকে ফিরেচি। সেখানেই রাত্রে খেলাম, আগামী রবিবারের Outing-এর নক্সা করলাম, তারপর আমি আর নিরোদবাবু মোটরে ফিরি। আজ এইমাত্র সাহেবের ওখান থেকে আস্‌চি। সাহেব একটু দমে গিয়েচে—আমি ফণিবাবুর সঙ্গে ওটা মিটিয়ে ফেল্‌তে বল্লুম।

কন্‌ভেণ্ট রোড্‌টা অন্ধকার, এখানে ওখানে যুঁই ও মালতীর সুগন্ধ, আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার, নক্ষত্রে ভরা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্ল্লুম, সাহেবের হাঙ্গামাটা যেন মিটে যায়।

একটা কথা মনে হচ্চে। মানুষের মনের ব্যপকতা যত বাড়্‌বে ততই সে পূর্ণ মনুষ্যত্বকে লাভ করবে। এমন সব মানুষ জীবনে কতই দেখলাম তাদের মনের সতর্কতা, চৈতন্যের ব্যাপকতা বড়ই কম। এত কম যে আহার বিহার ও অর্থোপার্জ্জনের বাইরে যে আর কিছু আছে, তা তারা ভাবতে পারে না। জ্ঞান বল, বিজ্ঞান বল, আর্ট বল, সাহিত্য বল—এ সবের কোন মূল্য নেই তাদের কাছে। এমন কি স্নেহ, প্রেম, কল্পনা, বন্ধুত্ব, এ সবও তাদের অজ্ঞাত—loyalty-কে তারা ভীরুতা ভাবে, স্নেহকে দুর্ব্বলতা ভাবে। ফণিবাবু একজন এই ধরণের মানুষ। এ সব লোকের নির্ব্বুদ্ধিতা আমি বরদাস্ত কর্ত্তে পারিনে একেবারেই। মূর্খতারও একটা সীমা আছে, এদের তাও নেই।

সে যাক্। এই চৈতন্যের ব্যাপকতার কথা বল্‌ছিলাম। এই মুক্ত প্রকৃতি, সবুজ ঘাসে মোড়া ঢালু নদীতীর, কাশবন, শিমূলবন, পাখীর ডাক—নীল পর্ব্বতমালা, অকূল সমুদ্র, অজানা মহাদেশ—এই হাসিমুখ বালক-বালিকা সুন্দরী তরুণী, স্নেহময়ী পত্নী, উদার বন্ধু, অসহায় দরিদ্রদল,—এই বিরাট মানব জাতির অদ্ভুত ইতিহাস, উত্থানপতন, রাজনীতির ও সমাজনীতির বিবর্ত্তন, এই বিরাট নক্ষত্রজগৎ, গ্রহ, উপগ্রহ, নিহারিকা ধূমকেতু, উল্কা—জানা অজানা জাগতিক শক্তি,—এই X-ray, বিদ্যুৎ, Invisible rays, high penetrating radiation,—ওই মৃত্যুপারের দেশ, মৃত্যুপারের বিরাট জীবন—এই রহস্যে স্পন্দমান, অসীম, অদ্ভুত জীবনরহস্য—এই সৌন্দর্য্যে এই বিরাটতা, এই কল্পনার মহানীয়তা,—এসবে যারা মুগ্ধ না হয়, গরু মহিষের মত ঘাস দানা পেলেই সন্তুষ্ট থাকে, যারা এই রহস্যময় অসীমতার সম্বন্ধে অজ্ঞ, নিদ্রিত ও উদাসীন রইল—সে হতভাগ্যগণ শাশ্বত ভিখারী—তাদের দৈন্য কে দূর কর্ত্তে পারবে?

মানুষের মত যত উদার হবে, যত সে নিজের চৈতন্যকে বিশ্বের সবদিকে প্রসারিত করে দিতে পারবে, অণুর চেয়ে অণু, মহানের চেয়েও মহান্ বিশ্ব-বস্তুর প্রতি আত্মবুদ্ধিকে যত জাগ্রত করে তুল্‌তে পারবে—সে শুধু নিজের উপকার করবে না, নিজের মধ্যে দিয়ে সে শতাব্দীর সঞ্চিত অন্ধকারজাল ও জড়তাকে প্রতিভার ও দিব্যদৃষ্টির আলোকে প্রসারিত করে দিয়ে যাবে। সেই সত্য—সত্য নিত্যকালের মশালচি।

সেদিন চারু বিশ্বাসের বাড়ীতে অনেক রাত পর্য্যন্ত মিটিং হোল। রাত দশটার পরে সেখান থেকে রওনা হয়ে আস্‌তে গিয়ে লাউডন ষ্ট্রীটের মোড়ে একটা টায়ার গেল ফেটে। মৌলালীর মোড়ে আবার মহরমের বেজায় ভীড়। অনেক কষ্টে বাড়ী পৌছলাম। ভোরে স্নান সেরে বসে আছি নীরদবাবু গাড়ী নিয়ে এলেন। চা পান করে দম্‌দম্ থেকে বেরুনো গেল। বনগাঁর পথে এ গাড়ীরও একখানা টায়ার গেল। বনগাঁয়ে পৌছে বাজার করে বেলেডাঙ্গা পৌছুতে বেলা নয়টা। বটতলায় গিয়ে কাঠ কুড়িয়ে সবাই মিলে রেঁধে খেলাম। শ্যামচরণদাদাদের বাড়ী এলাম—সেখান থেকে নৌকা করে নকুদুলের ঘাট পর্য্যন্ত বেড়ালুম—সবাইপুরের ঘাটে স্নান কর্ল্লুম। তারপরে সেদিন রাত্রে দম্‌দমাতে ফিরে খেয়ে আবার এলুম বাসাতে।

এবার বাড়ী গিয়ে বড় গোলমাল। ক'দিন বেশ কেটেছিল, শ্যামাচরণ দাদার স্ত্রীর স্নেহ বড় উপভোগ করেচি—বৌদি বড় ভাল মেয়ে—আমার শ্রদ্ধা হয়েচে। বর্ষা-বাদ্‌লার দিনে পুঁটীদিদিদের বাড়ী গরু-বাছুরের সঙ্গে একঘরে বাস করে মনটা খিঁচে উঠেছিল। ওখানে এবার তুফন্ ঠাকরুণ মারা গেলেন। আসবার আগের দিন তাঁর শ্রাদ্ধ হোল। রোজ বিকেলে বকুলতলায় বস্‌তুম। জগা ছড়া বল্‌তো—

"অশন বসন রণে সদা মানি পরাজয়,
ছনয়নে বারিধারা গঙ্গা যমুনা বয়—
কথায় কথায় তুমি যেতে বল যমালয়,"—ইত্যাদি

ছেলেমানুষের মুখে বেশ লাগ্‌তো।

কিছুদিন কলিকাতা গিয়ে রইলাম। একদিন নীহার রায়ের ওখানে গেলাম, সেখানে তার অনেক বন্ধুবান্ধব বসে আছে, 'অপরাজিত' সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হোল। নীহার বল্লে—'অপরাজিত' একটা Great Book, আমি এঁদের সেই কথাই বল্‌ছিলাম, আপনি আস্‌বার আগে। ধূর্জ্জটীবাবুর বাড়ীতে একদিন 'অপরাজিত' নিয়ে আলোচনা হোল আমার সঙ্গে। ভদ্রলোক অনেক জায়গা দাগ দিয়ে পড়েচেন, মার্জ্জিনে নোট্ লিখে। তারপর নীরদের বাড়ীতে চা-পার্টি উপলক্ষে সুনীতিবাবু ও রঙীন্ হালদারের সঙ্গে সে সম্বন্ধে অনেক কথা হোল।

রবিবারে গেছলাম, আবার পরের রবিবারে ফিরি। সেদিন রাণাঘাটে নেমে কি ভয়ানক বর্ষা। গোপালনগরে নাম্‌লাম অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। অতি কষ্টে গাড়ী যোগাড় করে ফির্‌লাম। হাটবার, সুশীলবাবু একটা মোট পাঠিয়েছিলেন শ্যামাচরণদাদার জন্যে—সেটা তাঁদের দিলাম।

কাল খুব গুমট হয়েছিল। বৈকালে জেলি, সরলা এরা পড়তে এল—বকুলতলায় চেয়ার পেতে বসে খুকুর সঙ্গে খুব গল্প কল্লু ম। রিম্‌ঝিম্ বর্ষার মধ্যে মেঘভরা আকাশের তলা দিয়ে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলাম। ওপারে বর্ষাস্রোত বয়, গাছপালা, সবুজ তৃণভূমি—বৃষ্টিতে চারিধার ধোঁয়া—ধোঁয়া—তারপর গেলাম ওপাড়ার ঘাটে। জল গরম—নেমে স্নান কর্ত্তে কর্ত্তে চারিদিকে চেয়ে সে কি আনন্দ পেলাম—মাথার উপর উড়ন্ত সজল মেঘরাশি, জলের রং কাকের চোখের মত, কি সুন্দর কদম গাছটার রূপ—মনে হোল ভাগলপুরের সেই অপূর্ব্ব সবুজ কাশবনের চর—সুদূরপ্রসারী

প্রান্তরের সে সুন্দর প্রাণ-মাতানো স্মৃতিটা—সেও এমনি বর্ষা-সন্ধ্যা, এমনি মেঘেভরা আকাশ—হাতীর পিঠে চড়ে আমীনের সঙ্গে সেই বেড়ানোটা। আমি জলে সাঁতার দিলাম। মনে হোল যেন আমি পৃথিবীর কেউ নই—আমি দেবতা—এই মুহূর্ত্তে পাখা ছেড়ে এই মেঘ-ভরা আকাশ চিরে ওপারে বহুদূরে কোথায় উড়ে যাবো!

এমন আনন্দ সত্যিই অনেকদিন পাই নি।

এখনও সোঁদালিফুল আছে—কিন্তু এবার অতিরিক্ত বর্ষায় অনেক অনিষ্ট করেচে—অনেক ফুলই ঝরে পড়ে গিয়েচে। সোঁদালিফুল এত ভালবাসি যে ঘাটে নাইবার সময় ঘাটের ধারে যে গাছগুলো আছে, সেদিকের ফুলের ঝাড়গুলোর দিকে চেয়ে থাকি—নইলে যেন প্রাণের আনন্দ সম্পূর্ণ হয় না। দু'এক ঝাড় যা আছে, তাদেরও চেহারা বড় শ্রীহীন। কি করি, ওদের নিয়েই যা একটু আনন্দ পাই!···

আগের দিন জগন্নাথকে সঙ্গে নিয়ে বেলেডাঙ্গার মাঠে গিয়েছিলাম। এ দিন বৃষ্টি ছিল না, সুন্দর মাঠ, তৃণাবৃত সোঁদালিফুল এখনও গাছে গাছে খুব। দুটী রাখাল ছেলের সঙ্গে কতক্ষণ বসে গল্প করলাম, মাঠে ছুটোছুটী করে বেড়ালাম, নদীজলে সন্ধ্যায় নাইতে নেমে সাঁতার দিলাম খুব। মোড়টা ফিরতে কুঠীর পথে একটা ঝোপের মধ্যে একটা ডালে কি ফুল ফুটে আছে—বাল্যজীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়—এক সময়ে এরাই ছিল সহচর, এদের সব চিনি।

রোজ খেয়ে উঠে মুখ ধোবার সময় খুড়ীমাদের বাড়ীর পিছনে বাঁশতলার দিকে যাই। ঐ সময়টা বহু পুরাতন দিনের কথা মনে পড়ে যেন—পুরাতন বাল্য-দিনগুলি প্রতিদিন ঐ সময়টাতে ফিরে আসে।

এখনও গ্রীষ্মের ছুটি এবার শেষ হয় নি। পরশু পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু খুলবার সময় হয়েচে। মনটা বড় খারাপ হয়ে আসচে। কত কথা যে মনে আসচে—কত গ্রীষ্মের ছুটী এ রকম করে কাটলো। অথচ দেশে তো আমার কেউ নেই—যখন ছিল সে ছিল আলাদা কথা।

এবার জ্যৈষ্ঠ মাসটা বড় বর্ষা। যখন বাঁশতলী গাছে আম পেকে টুকটুক কর্চ্ছে, তখন যুগল কাকাদের চারা বাগানে আম পাকচে—তখন বর্ষার আকাশ এমন ঘন মেঘাচ্ছন্ন, যেন শ্রাবণ মাস কি আষাঢ় মাস। যে সময়ে কলেজে পড়বার সময়ে আমি বেলেডাঙার পথের বটতলার শান্ত আশ্রয় ছেড়ে

কল্‌কাতার নিরাশ্রয়তার মধ্যে চলে আসতুম্‌। খুব কষ্ট হ'ত। এবারে কিন্তু কত দিন পর্য্যন্ত আমি রইলাম! কি সুন্দর বর্ষাদৃশ্য এবার দেখলাম ইছামতীর চরে, ইছামতীর কালো জলের ওপরে! কি বড় বড় মেঘের ছায়া!...ঘাটের পথে খেজুর গাছটায় খেজুর এখনও বোধ হয় খুঁজ্‌লে দু'একটা পাওয়া যাবে।

ওদের নিয়ে রোজ পাঠশালা কর্ত্তুম, খুকু sentence লিখ্‌তো, জগা ছড়া বল্‌তো :—

'এঁতল বেঁতল তামার তেঁতল
ধর্ত্তো বেঁতল ধরো না—'

কি মানে এর, ওই জানে—অথচ কি উৎসাহেই আবৃত্তি কর্ত্তো!...শিবু ও সুরো ধনুক-বাণ নিয়ে যাত্রা কর্ত্তে আস্‌তো, খুকু কত রাত পর্য্যন্ত বসে আমার কাছে গল্প শুন্‌তো,—জ্যোৎস্না উঠে যেতো তবুও সে বাড়ী যেতে চাইতো না। এক একদিন আবার দুপুরে এসে বলতো, গল্প বলুন। আস্‌বার দিন বকুলতলায় বসে ওকে খাতা বেঁধে দিলাম, sentence কর্ত্তে দিয়ে বলে এলাম, এসে আবার দেখ্‌বো।

"মায়ের ভাঙা কড়াখানা উল্টে পড়ে গিয়েচে, ভিটেটাতে বড় বেশী জঙ্গল হয়েচে"—অপু যেমন বইতে লিখেচে।

কুঠীর মাঠে গিয়ে এক একদিন গামছা পেতে শুয়ে থাকতুম—খুব হাওয়া বড় চমৎকার লাগ্‌তো। কিন্তু যখন ইছামতীর জলে নাইতে নামতুম সকালে ও বিকেলে—সেই সময়ই সকলের চেয়ে লাগ্‌তো ভালো। ও-পাড়ার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুলতো চোখের সম্মুখে তা কাকে বলি, কে-ই বা বুঝ্‌বে? যখন আসি তখনও বৌ-কথা-ক' ছিল, তখনও পাপিয়া, কোকিল ডাকতো, অথচ তখন তো আষাঢ় মাস পড়েই গিয়েছিল।

এবার এ-বাড়ী ও-বাড়ী এত নিমন্ত্রণ সবাই করে খাইয়েছে—কেন জানি না, অন্যবার এত নিমন্ত্রণ তো করে না।

দেবব্রতকে কত কাল দেখি নি—তার মুখ ভুলেই গিয়েচি—এতকাল পরে এইবার দেখ্‌বো।

সেদিন বনগাঁয়ে গেছ্‌লাম—সকালে খুকীর সঙ্গে পাকা রাস্তায় সাঁকোয় কত খেলা কর্ল্লুম। খুকী কত ফল তুল্‌লে, পাতা তুল্‌লে, আমিও কত ফল পেড়ে নিয়ে এসেছিলাম; খুকী রাঁধ্‌লে। খুকীর সঙ্গে ছেলেমানুষী

খেলা খেলে ভারী আনন্দ পাই। * খুকী কিন্তু পড়াশুনো করে না, এই ওর দোষ। খুকু এর মত নয়, খুকু খুব বুদ্ধিমতী, পড়াশুনোয় খুব ঝোঁক।

বনগাঁয়ে সেদিন বোটের পুলে বিশ্বনাথ, দেবেন, সরোজ সবাই বসে গল্প কর্চ্ছিল, আমি যেতে অনেকক্ষণ বসে গল্প হোল, বিশ্বনাথ নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে খুব খাওয়ালে। রাত্রে এই দিন বন্ধুর বাসায় খাওয়ার পরে জ্যোৎস্নায় বেড়াতে বেড়াতে বনগাঁ স্কুলের ফটকে ঠেস্ দেওয়ানো বেঞ্চিটার ওপর গিয়ে বসলাম। কত কথা মনে আসে! চব্বিশ বছর আগে একজন বারো বছরের ক্ষুদ্র বালক একা বাড়ী থেকে ভর্ত্তি হতে এসে ওই জায়গাটাতে লাজুক ভাবে চুপ করে বসে ছিল—কতকাল আগে! সেদিনে আর আজকার মধ্যে কত তফাৎ তাই ভাবি। হেড্‌মাষ্টার মশায়ের ঘরের সাম্‌নে বেড়িয়ে এলাম—বোর্ডিং-এর সব ঘরের সাম্‌নে বেড়ালাম। কিন্তু পর পর সেদিনের কথাটা মনে আস্‌ছিল—একটী ছোট ছেলে বর্ষায় জলা ও আষাঢ়-শ্রাবণের আউশ ধানের ক্ষেত ভেঙে এক-গা কাদা মেখে চাদর গায়ে মায়ের কাছ থেকে ভর্ত্তি হওয়ার সামান্য টাকা ও দুটি পয়সা জলখাবারের জন্যে বেঁধে এনে লাজুক মুখে চুপ করে ওই স্কুলের পৈঠার উপর বসে আছে—এমন মুখচোরা যে, কাউকে বল্‌তে পার্‌চে না ভর্ত্তি কোন্ ঘরে হয়, বা কাকে বল্‌তে হবে?

সেই ছোট ছেলেটী চব্বিশ বছর আগেকার আমি কিন্তু সে এত দূরের ছবি, যে আজ যেন তার ওপর অলক্ষিতে স্নেহ আসে।

ওঃ, এবার যেন ছুটীটা খুব দীর্ঘ মনে হচ্চে, সেই কবেকার কথা সুশীল বাবুর স্ত্রী বটতলায় ভাত রেঁধে আমাদের পরিবেশন করে খাইয়েছিলেন, আমরা কাঠ কুড়িয়েছিলাম, যুগল এসে দাঁড়িয়ে কথা কয়েছিল—সে কত দিনের কথা। তার পর গোপালনগরের বারোয়ারী, তুফন্ ঠাকুরুণের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ, সে সবও কতকালের কথা। বড় চারার আম কেনা, মাঠের চারার আম কেনা, সে সবও আজকার কথা নয়। আঁচানোর সময়ে খুড়ীমাদের বাড়ীর পিছনে গাছপালা ও বাঁশবনের দৃশ্যটা এত অদ্ভুত যেন একেবারে শৈশবে নিয়ে যায় এক মুহূর্ত্তে।

* খুকু এবং খুকী এক নয়,—খুকু থাকে বারাকপুরে, আর খুকী বনগাঁয়ে

জীবনের রূপ ও সৌন্দর্য্যে ডুবে গেলাম। হে ভগবান্! এর তুলনা দিতে পারিনে।

পঞ্চানন চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে আলাপ হোল, ইউনিভার্সিটীর একটী brilliant ছেলে, রেবতীবাবুর বন্ধু। পথে আস্‌তে আস্‌তে অবনী ও শৈলেনবাবুর সঙ্গে দেখা। তারা মনোজের বাড়ী কাঁঠাল-খাবার নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্ত্তে চলেচে। বৃষ্টি আস্‌চে দেখে আমি দৌড় দিলাম।

বাসায় এসে ঠিক কর্ল্লুম এই ঘরটা আমি একলা নেবো। এ বৎসরটা খুব পড়বো, লিখ্‌বো, চিন্তা করবো। Prescott's Peru, Shackleton's Voyages ও Historiography-র ভাল বই এবার পড়্‌তে হবে—যদিও Prescott আমার পড়া আছে, তবু আর একবার পড়্‌বো। চিন্তায় যে নির্জ্জনতা চাই, তা ঘরে একা না থাক্‌লে হবে না। Crystallography সম্বন্ধে কিছু পড়তে হবে।

এ কয় মাস এই খাতাখানা হারিয়ে গেছল। তাই মাস পাঁচেক ধরে এতে কিছু লেখা হয় নি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, খাতাখানা ছিল আমার বড় বাক্সটাতে, সে বাক্সটা কত বার খুঁজেচি খাতাখানার জন্যে, তবু সন্ধান পাইনি। আজ পালিতদের তারাপদবাবু এলেন সন্ধ্যার সময়ে। তাঁদের সে ঠিকুজী-কুষ্ঠীখানা আমার কাছে অনেক দিন পড়ে আছে, তাই ফিরিয়ে নিতে এলেন। বাক্স খুলে ঠিকুজীখানা খুঁজতে খুঁজতে এ খাতাখানাও বার হয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে—এই পাঁচ মাসের মধ্যে—আমার জীবনের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। সব দিক থেকে পরিবর্ত্তন। জ্ঞান মারা গিয়েচে, ওর সংসার পড়েচে আমার ঘাড়ে, জীবন ছিল দায়িত্বহীন, অবাধ—এখন আমি পুরোদস্তুর ছাপোষা গেরস্ত মানুষ। বনগাঁয়ে বাসা করে ওদের সব সেখানে এনে রেখেচি। সেটা যখন আমার কর্ত্তব্য, তখন তা আমায় কর্ত্তেই হবে, স্বার্থপর হতে পারবো না কোনোদিন।

আরও পরিবর্ত্তন হয়েচে। ক্লারিজ সাহেব চলে গিয়েচে, দেবব্রত চলে গিয়েচে। কোথায় গিয়েচে, বা দেবব্রতের কি হয়েচে তা আমি লিখ্‌বো না। কিন্তু আমার মনে যে ব্যথা লেগেচে এতে—ভেবে দেখবারও অবকাশ পাইনে সব সময়। এক-একবার গভীর রাত্রে মনে পড়ে, ঘুম আসে না চুপ

করে থাকি—অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করি—সে ব্যথা বড় সাংঘাতিক—যাক্ ওকথা আর লিখে কি হবে!

সেদিন শিররাত্রি গেল। এই শিবরাত্রির সঙ্গে আমি সেদিন বসে বসে হিসেব করে দেখ্‌ছিলাম যে, জীবনের কত সুখদুঃখের কাহিনীই না জড়িত রয়েচে! মধ্যে একদিন এসেছিল বনগাঁয়ের হরবিলাস—নৃপেন রায়ের নতুন কাগজের জন্যে, (তার নাম আমি আজই করে এসেছি 'উদয়ন')—তাকে বল্লুম—তোমাদের বাসাটা আমায় দেবে? আমি গভীর রাত্রে বসে বসে ভাবছিলাম, তা যদি হয়, ওরা যদি বাসাটা ছেড়ে দেয়—তা হ'লে সেখানে কি করে বাস করবো? কত কথাই না মনে পড়বে! মনে পড়বে আমি যখন বালক, কিছুই বুঝিনে—বনগাঁয়ে হেড্‌মাষ্টার মশায়ের বেতের বিভীষিকায় দিনরাত কাঁটা হয়ে থাকি—সেই সব দিনের কথা। সেই এক শিবরাত্রি—কিন্তু না তার আগেও শিবরাত্রির কথা আমার মনের মধ্যে জাগ্রত আছে। ছেলেবেলায় হালিসহর থেকে সেই যে এসেছিলাম—ছোট মামা প্রভাতী গান কর্ত্ত বৈষ্ণবদের সুরে—আমি শীতে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে নদী থেকে নেয়ে আস্‌তুম—জীবনের সেই প্রথম শিবরাত্রি যার কথা মনে আছে। তারপর অবিশ্যি বনগাঁয়ের ঐ শিবরাত্রি। ওঁরা এসে বাইরের ঘর থেকে আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন মন্ত্র পড়াতে—বেশ মনে আছে। তাই ভেবেছিলাম এতকাল পরে—জীবনের এত অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের পরে আবার হরবিলাসদের বাসায় থাক্‌বো কেমন করে?

ছোট খুকী সম্প্রতি মারা গেছে। ও কেন এসেছিল তাই জানি না। আট মাস বেঁচেছিল—কিন্তু এত দুঃখ পেয়ে গেল এই অল্পদিনের মধ্যে তা আর কাকে বলি? ও আপন মনে হাস্‌তো—কিন্তু সবাই বল্‌তো "আহা কি হাসেন, আর হাস্‌তে হবে না, কে তোমার হাসি দেখ্‌চে?"—ওর অপরাধ—ও জন্মাবার পর ওর বাবা মারা গেল। সত্যিই ওর হাসি কেউ চাইত না। ওর বাবা তো মারা গেল; ওর মারও সঙ্কটাপন্ন অসুখ হোল—ওকে কেউ দেখ্‌তো না—ওর খুড়ীমা বল্লে—টাকা পাই তো ওকে মাইয়ের দুধ দি। ওকে নারকোল তলায় চট পেতে শুইয়ে রাখ্‌তো উঠানে—আমার কষ্ট হোত—কিন্তু আমি কি করবো? আমি তো আর স্তন্যদুগ্ধ দিতে পারিনে? ওর রিকেট্‌স্ হোল। দিন দিন শীর্ণ হয়ে গেল—তবুও মাঝে মাঝে বনগাঁয়ের

বাসায় বাইরের দালানে শুয়ে সেই অকারণ অর্থহীন হাসি হাস্‌তো—সেদিনও তেম্‌নি হাস্‌তে দেখে এসেচি—ও শনিবারে যখন বাড়ী থেকে আসি। Unwanted Smile! কিন্তু সে হাসি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েচে গত মঙ্গলবার থেকে—খয়রামারির মাঠে ওর বালিশটা পড়ে আছে সেদিন দেখেচি—এ ছাড়া আর কোনো চিহ্ন কোথাও রেখে যায় নি ও। Poor little mite! কিন্তু আমি বলি ও হাসি শাশ্বত,—এই বসন্তে বনে বনে ঘেঁটুফুলের দলে ফুটেচে, ফুলে ফুলে কত কাল ধরে ফুটে আস্‌চে—কালের মধ্যে দিয়ে ওর জীবনধারা অপ্রতিহত, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ও নিত্য—খুকীর হাসিও তেম্‌নি।

পার্ক সার্কাস থেকে ট্রামে আস্‌তে আস্‌তে তারাভরা নৈশ আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনে এ সত্য জেগেচে—এই ঘূর্ণ্যমান, বিশাল নাক্ষত্রিক জগৎ, এই সৃষ্টিমুখী নীহারিকার প্রজ্বলন্ত বাষ্পপুঞ্জের রাশি—এই অনাদ্যন্ত মহাকাল—এরা যেমন নিত্য, যতটুকু নিত্য, যে অর্থে নিত্য, তার চেয়ে কোনো অংশে কম নিত্য নয় আমার অবোধ, অসহায়, রোগশীর্ণ খুকীর দন্তহীন কচিমুখের অনাদৃত, অপ্রার্থিত, অর্থহীন, অকারণ হাসিটুকু। বরং আমি বল্‌চি তা আরও বড়—এই বিশ্বের কোথাও যেন এমন একটা বিপুল ও সুপ্রতিষ্ঠ অধ্যাত্মনীতি আছে, উদীয়মান সবিতার রক্তরাগের মত তা অন্ধকারের মধ্যে আলোর সঞ্চার করে, জড়ের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন জাগায়, সকল সৃষ্টিকে অর্থযুক্ত করে—এইজন্য অর্থযুক্ত করে যে, যে গৌরবে সৃষ্টির সৌন্দর্য্য রূপ পেয়েচে, মহিমময় হয়েচে—সেই বর্ণ সবিতার দান, আদিম অন্ধকারে অবগুণ্ঠিতা বসুন্ধরার মুখের অপসারিত করেছেন সবিতা তাঁর আলোর অঙ্গুলির স্পর্শে—তাকে সার্থক করেচেন, জাগ্রত করেচেন, মাটির মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা তাঁরই তেজোময় মন্ত্রে।

খুকীর হাসি সবিতার ওই অমৃতজ্যোতির মত, তা মৃত্যুঞ্জয়ী, তা বিশ্বের জড়পিণ্ডে প্রাণের সঞ্চার করে, বিপুল সৃষ্টিকে অর্থযুক্ত করে, গৌরবময় করে।

তা মিথ্যা নয়, অনিত্য নয়,—তা শাশ্বত, তা অমৃত। এবং তা সম্ভব হয়েচে সৃষ্টির ওই অধ্যাত্মনীতির আইনে—ও নীতি অমোঘ—ওর শক্তি ও ওর সত্য অস্তিত্ব অন্তরতম অন্তরে অনুভব কর্ত্তে পারি—কিন্তু ভাষায় বোঝানো যায় না।

* বেলা পড়ে এসেচে। রাঙা রোদ দূরের পাহাড়ের মাথায়, শালবনে, রাঙামাটীর টিলার গায়ে। চারিধার কত নিঃশব্দ—আকাশ কেমন নীল—অনেকদিন এমন মনের আনন্দ পাইনি—কল্‌কাতার মুমূর্ষু নিস্তেজ মন কাল সারা রাত ও আজ সারাদিনের মাঝে বন্য-সৌন্দর্য্য দেখে, প্রথম বসন্তে ফুটন্ত পলাশ বনের ও ধাতুক ফুলের প্রাণবন্ত রূপ দেখে—ইব্ ষ্টেশনের অরণ্য-নদী-পর্ব্বত সমাচ্ছন্ন বিরাট পটভূমির দৃশ্যে একমুহূর্ত্তে তাজা হয়ে উঠল—কি ঘন শালপলাশের বন—কি সুন্দর জনহীন প্রান্তর, দূরে দূরে নির্জ্জন পর্ব্বতমালা—মন অভিভূত হয়ে পড়ে কিন্তু হৃদয়ের অভ্যন্তরে মাথা সতেজ হয়ে ওঠে। রোদ কি অপূর্ব্ব রাঙা হয়ে এসেচে—ষ্টেশনের পাশের পথটা দিয়ে সোমড়ার হাট থেকে সাঁওতালী মেয়েরা হাট করে ঝুড়ি মাথায় নিয়ে যাচ্চে। হাটটায় এইমাত্র আমি, প্রমোদবাবু ও কিরণবাবু বেড়াতে গিয়েছিলাম—বেগুন, রেড়ির বীজ, কচি ইঁচড়, চিংড়ি, কুম্‌ড়া, খই, মুড়ি, বিক্রি করচে। এক জায়গায় একটী সাঁওতালী যুবতী ধান দিয়ে মুড়কি নিচ্চে। এই হাটের সামনে একটা প্রাকৃতিক জলাশয়ে আমরা স্নান কর্ল্লুম। ভারী আনন্দ পেয়েচি আজ—ভাগলপুরে ছেড়ে আসবার পরে এত আনন্দ সত্যই অনেককাল পাই নি।

রোদের রাঙা রং অতি অপূর্ব্ব!

ডাকবাংলা থেকে লোকে জিজ্ঞেস্ কর্ত্তে এসেচে আমরা রাত্রে কি খাবো।

† সকালে আমরা রওনা হলাম। পথে কি সুন্দর একটা পাহাড়ী ঝরণা। সির্-সির্ করে পাহাড়ী নদী বয়ে চলেচে। কতকগুলি লোক একটা কাঠের পুলের ওপর খড় বিছিয়ে দিচ্চে। তারা বল্লে, পাটোয়ারীর ছেলে এপথে চলে গিয়েচে। পাহাড়ী করবীর দল জলের ধারে ফুটে রয়েচে! শান্ত শাল-পলাশের বনের ছায়া। এখানে সবাই উড়িয়া বুলি বল্‌চে। এমন ভাল লাগে!

নীল আকাশের তলে অফুরন্ত বাঁশের জঙ্গল। শাল-পলাশের বনে রোদ ক্রমে হল্‌দে হয়ে আস্‌চে। প্রিণ্ডোলা থেকে গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে ৭।৮ মাইল পথ হেঁটে দুপুরে বিক্রমখোলে পৌছলাম। বিক্রমখোলের

* সম্বলপুর † বিক্রমখোলার পথে

গায়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরে উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হয়েচে—তাই দেখ্‌বার জন্য আমরা এখানে এসেচি। লেখাটা ভারী চমৎকার জায়গায় —একটা Limestone-crag-এর নীচে ছায়াভরা জায়গায় প্রাকৃতিক ছোট একটা গুহা মত—তারই গায়ে লেখাটা। চারিধারের বন যেমন গভীর তেমনি সুন্দর—পথের মধ্যে জঙ্গলে কত ধরণের গাছ। আমলকী ও হরিতকীর বন—আমরা আমলকী ফল কুড়িয়ে খেতে খেতে এলাম। প্রিগোলা গাঁয়ের পাটোয়ারী আমাদের জন্যে মুড়কী ও দুধ নিয়ে এল। উড়িষ্যার এই গভীর জঙ্গলে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিলালিপি ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেচে।

জায়গাটা অতীব গভীর অরণ্যময়—কি অপূর্ব্ব নীল আকাশ অরণ্যের মাথায়—কি অপূর্ব্ব নিস্তব্ধতা...পাহাড়ের crag, তার ছায়ায় আমরা কতক্ষণ বসে রইলাম—ছেড়ে যেতে আর ইচ্ছে করে না—ইচ্ছা হয় না যে আর বেলপাহাড়ে ফিরি। আবার গাড়ীতে উঠি। আবার কল্‌কাতায় যাই।

প্রিগোলা নামে একটা গাঁ পাহাড়ের পাদদেশে—এইখান দিয়ে বিক্রমখোল যেতে হয়। আমরা বেলা দশটার সময় এখানে পৌছলাম একটু পরেই পাটোয়ারী গাড়ী করে এল। গাঁয়ের 'গাঁউঠিয়া' অর্থাৎ গ্রাম-প্রধানের নাম বিম্বাধর—সে তাড়াতাড়ি আমাদের জন্যে দুধ ও মুড়কী নিয়ে এল খাবার জন্যে। একটু বিশ্রাম করে আমরা বিক্রমখোল রওনা হলাম—দেখা শুনো করে ফিরে আবার গাঁয়েই এলাম। ওবেলাকার নাচের দল নাচ দেখালে। আমরা একটা ফটো নিলাম। আমাদের কোনো অদৃষ্টপূর্ব্ব জীব ভেবে এখানকার লোকেরা ঝুঁকে পড়েচে—দলে দলে এসে আমাদের চারিপাশে দাঁড়িয়েচে। প্রমোদবাবু মুখে সাবান মেখে দাড়ি কামাচ্চেন—এরা অবাক হয়ে চেয়ে আছে—এ দৃশ্য আর কখনও দেখেনি বোধহয়। ফটোগ্রাফ নেবার সুবিধের জন্যে নাচ হোল পথের ওপর—ঝম্‌-ঝম্‌ করচে রোদ—নাচওয়ালীদের মুখের ওপর বড় রোদ্দুর পড়েচে দেখে আমি পরিমল বাবুকে তাড়াতাড়ি snap-টা সেরে নিতে বল্লুম।

নাচ গান শেষ হোল। প্রমোদবাবু, পরিমলবাবু ও কিরণ হেঁটে রওনা হলেন বেলপাহাড়ে। আমার পায়ে ফোস্কা পড়েচে বলে হাঁটতে পারা গেল না। গরুর গাড়ীতে ওঁদের জিনিসপত্র নিয়ে আমি ঘণ্টাখানেক পরে রওনা হলাম।

বেলা পড়ে গিয়েচে। বিম্বাধর অনেকদূর পর্য্যন্ত আমার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে এল। পথের পাশের আমতলায় সেই নাচের দল রেঁধে খাচ্চে। সেই দাড়িওয়ালা বৃদ্ধটি ভাত খাচ্চে শালপাতায়। পাশে অদ্ভুত গড়নের কাঁসার বাটিতে কি তরকারী।

গ্রাম পার হলুম। দুধারে শালবন, মাঠ, চারিধারে শিলাখণ্ড ছড়ানো। রোদ-পোড়া মাটীর সুগন্ধ ভাগলপুরের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভাগলপুর নয়—ইসমাইল্‌পুরের জঙ্গলের কথা। মুক্ত অরণ্যানী চারিধারে—নিঃশ্বাস চাপা বন নয়—উচ্চাবচ প্রান্তর ও শালবন, দুইধারেই উঁচু পাহাড়—গিরিসানু অরণ্যে আবৃত। একটু পরেই চাঁদ উঠ্‌ল—নবমীর জ্যোৎস্না। শালবনের রূপ বদ্‌লে গেল—পাহাড়শ্রেণী রহস্যময় হয়ে উঠ্‌ল—কি সুন্দর হাওয়া! কি মাটীর সুগন্ধ! অনেকদিন কল্‌কাতা শহরে আবদ্ধ থাকার পরে এই শালবনের হাওয়া ও বিরাট Space-এর Sense-টা যেন আমায় নবজীবন দান করচে। সুবিধে ছিল ওরা সবাই আগে চলে গিয়েচে—আমার গাড়ীতে আমি একা। তাই বসে নিরিবিলি ভাববার যথেষ্ট সময় পেয়েছিলাম—ওরা সঙ্গে থাক্‌লে কেবল বক্‌ বক্‌ গল্প হোত।

চাঁদের জ্যোৎস্না আরও উজ্জ্বলতর হোল। কি নির্জ্জন চারিদিক! বাম দিকের পাহাড়শ্রেণীর মাথায় সেই দুটো নক্ষত্র উঠেচে—যা আমি পার্ক সার্কাসে যাবার সময় রোজ সন্ধ্যাবেলা দেখি। চোখ বুজে কল্পনা করবার চেষ্টা কর্‌লুম কোথায় পার্কসার্কাস, আর কোথায় এই মহিমাময় মুক্ত অরণ্যভূমি, পাহাড়শ্রেণী, প্রান্তর, বাঁশবন, ঝর্ণা—উড়িষ্যার এই সৌন্দর্য্যময় প্রত্যন্তদেশ!···আমি অবাক্‌ হয়ে গেলাম, মুগ্ধ হয়ে গেলাম—ঘণ্টা দুই চল্‌বার পর আমি যেন একেবারে এই অপার্থিব জ্যোৎস্নার জগতে, এই অজানা অঞ্চলের ততোধিক অজানা পাহাড় ও অরণ্যানীর মায়ায় আত্মহারা হয়ে ডুবে গেলাম—এত কথাও মনে আসে এই সব জায়গায়। আমি ভেবে দেখলাম মন এ সব স্থানে এলে অন্য রকম হয়ে যায়। কল্‌কাতায় এ সব চিন্তা মনে আসে না—এখানে এই দু' ঘণ্টার নির্জ্জন ভ্রমণে যা মনে এল। জীবনে এমন একটা দিন আসবে, যখন আমাকে এই রকম নির্জ্জন স্থানে একা বাস কর্ত্তেই হবে, নৈলে আমার মনের গোপন গভীরতম দেশে কি সব কথা আছে আমি নিজেই বুঝতে পারবো না।

ভারতবর্ষের রূপটাও যেন নতুন করে বুঝতে পারলাম। ভেবে দেখলাম

—আর্য্যাবর্ত্তের সমতলভূমি বাদে ভারতের সবটাই এই ধরণের ভূমি। B. N. R.-ই দেখো না কেন—সেই খড়্গপুর থেকে আরম্ভ হয়েচে রাঙামাটী, পাহাড় ও শালবন—আর বরাবর চলেচে এই চারশ' মাইল—এর পরও চলেচে আরও চারশ' মাইল—চারশ' মাইল কেন, আরও আটশ' মাইল বম্বে পর্য্যন্ত। অরণ্যের দৃশ্য সেখানে যেতে আরও গম্ভীর—সহ্যাদ্রির মহিমময় ঘাটশ্রেণীর অপরূপ দৃশ্যের তুলনা কোথায়? ওদিকে মহীশূর, নীলগিরি—মালাবার উপকূলের ট্রপিক্যাল ফরেষ্ট—আর্য্যাবর্ত্তের সমতলভূমি পার হয়েই অতুলনীয় হিমালয়, Alpine meadows, ভারতের প্রকৃত রূপই এই—এই রাঙামাটী, পাহাড়, শালবন—এই আসল ভারতবর্ষের রূপ। বাংলার সমতলভূমিতে সারা জীবন কাটিয়ে আমরা ভারতের প্রকৃত রূপটী ধর্ত্তে পারিনে। অবশ্য বাংলার রূপ অন্য রকম, বাংলা কমনীয়, শ্যামল ছায়াভরা। সেখানে সবই যেন মৃদু ও সুকুমার—গাছপালা থেকে নারী পর্য্যন্ত। এ সব দেশের মত রুক্ষভাব ওখানে তো নেই!

মাথার ওপরে তারাভরা আকাশ। কি জ্বলজ্বলে নক্ষত্রগুলো—যেন হীরের টুক্‌রোর মত জ্বল্‌চে!...বিরাট—বিরাট—প্রকৃতি এখানে শিবমূর্ত্তি ধরেচে। কমনীয় নয়, সুষ্ঠু নয়, কিন্তু উদার, মহিমময়, বিরাট। বিরাট্‌ is the term for it.

হঠাৎ খুকীটার কথা মনে পড়ে গেল। ওর সেই অবোধ, অনাদৃত হাসিটুকুর কথা মনে পড়ল। এই বিরাট প্রকৃতি, ওই নক্ষত্রজগত, বিশাল উদার Space-এর মধ্যে ওর স্থান কোথায়? মরে সে কোথায় গেল? তার ক্ষুদ্র জীবনীশক্তি নিয়ে ও কি এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পার্ত্ত! Poor mite, what chance had she—a helpless thing?

কিন্তু বনের ওই হল্‌দে তিলের ফুলের থোকা—প্রথম বসন্তে যা থোকা থোকা ফুটেচে—তা দেখ্‌লে মনে আশা জাগে। আমি বল্‌তে পারি—এই বিরাটতার সঙ্গে মঙ্গল মিশে আছে, এই মহিমময় সন্ধ্যায় আত্মার সত্যদৃষ্টি খুলে যায়। বুদ্ধি দিয়ে সে জিনিস বোঝা যায় না, তর্কযুক্তির পথে তা ধরা দেয় না—তা প্রাণের মধ্যে আপনা আপনি ফুটে ওঠে, নির্জ্জন ধ্যানের মধ্যে দিয়ে—অপূর্ব্ব আনন্দের মধ্যে দিয়ে। মুখে বলে সে সব বোঝানো কি যায়?

ফিরে দেখি ডাকবাংলোতে ওরা আসে নি। আমি একাই অনেকক্ষণ

বসে রইলাম। সাম্‌নে চাঁদ উঠেচে নক্ষত্র জ্বল্‌চে। অনেকক্ষণ পরে ওরা এল। বল্লে, ষ্টেশনের কাছে একটা হায়েনা মেরেচে। আমি একটা শালপাতার পিকা আনিয়ে খেলাম।

সারারাত্রি আমরা গল্প করে জাগ্‌লাম। শেষ রাত্রে আমি কয়েকবার উঠে এসে এসে বাইরে দাঁড়ালাম—চাঁদ দূরে পাহাড়ের মাথায় অস্ত গেল। রাঙা হয়ে গেল চাঁদটা—অদ্ভুত দেখ্‌তে হোয়েচে!···

অনেক রাত্রে আমরা ষ্টেশনে এলাম। বেজায় শীত। ভোরবেলার দিকে ট্রেণটা এল। রাতে কি কষ্ট—মালের বস্তার ওপর বসে বসে ঢুলছিলাম—পরিমলবাবুকে জায়গাটা ছেড়ে দিলাম।

ভোর হোল কুলুঙ্গা ষ্টেশনে। কি অপূর্ব্ব পর্ব্বতের ও জঙ্গলের দৃশ্য। এমন Wilderness আমি খুব কমই দেখচি। যে ষ্টেশনে আসি—সেইটাই মনে হয় আগেকার চেয়ে ভাল। নোট্‌বুকে বসে বসে নোট্ করি, কি কি সেখানে আছে। গোইলকেরা ষ্টেশনটী বড় সুন্দর লাগ্‌ল। শাল জঙ্গল, পাহাড়, স্থানটাও অতি নির্জ্জন। বাংলাদেশের কাছে যত আসি ততই সমতল প্রান্তর বেশী। খড়্গপুরের ওদিকে কলাইকুণ্ডা জায়গাটী এ হিসাবে বেশ ভাল।

বাংলাদেশে গাড়ী ঢুকল। তখন বেলা একেবারে চলে গেছে। এ আর এক রূপ, অতি কমনীয়, শান্ত শ্যামল। চোখ জুড়িয়ে যায়, মন শান্ত হয় কিন্তু এর মধ্যে বিরাটত্ব নেই, majesty নেই—হৃদয় মন বিস্ফারিত হয় না, কল্পনা উদ্দাম হয়ে উঠে অসীমতার দিকে ছুটে চলে না। এতে মনে তৃপ্তি আসে—ছোটখাটো ঘরোয়া সুখ দুঃখের কথা ভাবায়, নানা পুরানো স্মৃতি জাগিয়ে তোলে—মানুষ যা নিয়ে ঘরকন্না কর্ত্তে চায় তার সব উপকরণ জোগায়। হাসি অশ্রু মাখানো লজ্জানতা পল্লীবধূটী যেন—তার সবই মিষ্টি, কমনীয়। কিন্তু মানুষের মন এ ছাড়া আরও কিছু চায়, আরও উদ্দাম, অশান্ত, রুক্ষ, রুদ্র ভাব চায়। বাংলাদেশে তা যেন ঠিক মেলে না। হিমালয়ের কথা বাদ দি—সেটা বাংলার নিজস্ব একচেটে জিনিস নয়—আর তার সঙ্গে সত্যিকার বাংলার সম্বন্ধই বা কি? পদ্মা? ··সেও অপূর্ব্ব, সন্দেহ নেই—কিন্তু সে আদরে পালিতা ধনীবধূ, একগুঁয়ে, তেজস্বিনী, শক্তিশালিনী, যা খুশি করে, কেউ আটকাতে পারে না—সবাই ভয় করে চলে—খামখেয়ালী—রূপবতী—তবে মিষ্টি নয়—high-bred রূপ ও চালচলন। ঘরকন্না পাতিয়ে নিয়ে থাক্‌বার পক্ষে তত উপযোগী নয়।

কল্‌কাতা ফিরে পরদিনই নীরদবাবুর বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ হোল সন্ধ্যায়। আমার আবার একটু দেরী হয়ে গেল। সুশীলবাবু মাঝের দিন আমার বাসায় এসেছিলেন—বঙ্গশ্রী আফিসে আমায় Phone করেছিলেন—যাবার সময় পার্ক সার্কাস থেকে ওঁর বাসা হয়ে গেলাম। সতীশের সঙ্গে একটা আফিমের দোকানে আজ আবার দেখা হোল। ক'দিন ধরেই উড়িষ্যা ও মানভূমের সেই স্বপ্নরাজ্য মনে পড়চে—বিশেষ করে মনে পড়চে আসানবলী ও টাটানগরের মধ্যবর্ত্তী সেই বনটা—যেখানে বড় বড় পাথরের চাঁই-এর মধ্যে শালের জঙ্গল—পত্রহীন দীর্ঘ গাছগুলিতে হল্‌দে কি ফুল ফুটে আছে—কেবলই ভাব্‌চি ওইখানে যদি একটা বাংলো বেঁধে বাস করা যায়—ওই নির্জ্জন মাঠ বন, অরণ্যানীর মধ্যে।

অপরাহ্নে ও জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে তাদের রূপ ভাব্‌লেও মন অবশ হয়ে যায়।

সকালে উঠে দীনেশ সেনের বাড়ীতে এক বোঝা পরীক্ষার কাগজ পেশ করে এলুম। সারা পথে মুচুকুন্দ চাঁপার এক অদ্ভুত গন্ধ! বিজয় মল্লিকের বাগানে একটা গাছে কেমন থোকা থোকা কাঁচা সোনার রং-এর ফুল ধরেচে। বড় লোভ হোল—ট্রাম থেকে নেমে বাগানের ফটকের কাছে গিয়ে দারোয়ানকে বল্‌লাম—ঐ গাছতলাটায় একবার যেতে পারি? সে বল্লে—নেহি। সংক্ষেপে বল্লে;—আমায় সে মানুষ বোলেই মনে কর্ল্লে না। আবার বল্লুম—দু' একটা ফুল নিয়ে আস্‌তে পারিনে? তলায় তো কত পড়ে আছে। সে এবার অত্যন্ত Contemptuous ভাবে আমার দিকে চেয়ে পুনরায় সংক্ষেপে বল্লে—নেহি।

ভালো, নেহি তো নেহি—গড়ের মাঠে খিদিরপুর রোডের ধারে অনেক মুচুকুন্দ ফুলের গাছ আছে, ট্রামে আসবার সময় দেখে এসেচি, সেখান থেকে কুড়িয়ে নেবো এখন।

তারপর এলাম নীরদবাবুর বাড়ী। সেখানে খানিকটা গল্পগুজব করে গেলাম শ্যামাপ্রসাদবাবুর বাড়ী। পাশের বৈঠকখানায় রমাপ্রসাদবাবু আছেন দেখ্‌লাম—শ্যামাপ্রসাদবাবুও তাঁর লাইব্রেরী ঘরে কি কাজ কর্চ্ছিলেন। সেখানে খানিকটা থাক্‌বার পরে বাসায় ফিরলাম।

বৈকাল বেলা। আজ রামনবমী। কতদিনের কথা মনে পড়ে। বৈকালে বসে বসে তাই ভাব্‌ছিলাম—বেলা পড়ে এসেচে—কত পাপিয়ার ডাকভরা

এই সময়ের সেই পুরাতন দুপুরগুলো।···বাঁশের শুক্‌না পাতার কথা কেন এত মনে হয়, তা বুঝ্‌তে পারিনে। সুভদ্রাকে কাল যখন পত্র লিখ্‌লুম— তখনও বাঁশবনের কথা ও শুক্‌নো পাতার রাশির কথাই মনে এল। পাপিয়ার গানের কথা বিশেষ করে মনে আছে। এই সব দিনের অতীত দুপুরগুলোর সঙ্গে পাপিয়ার গান জড়ানো আছে, আর জড়ানো আছে অদ্ভুত ধরণের wild আনন্দ !···

বেলা পড়ে এসেচে। গোঁসাইপাড়ার নারকোলতলায় আজও তেম্‌নি মেলা বসেচে, অতীত দিনের মত। বাদা ময়রা মুড়কী ও কদ্‌মা বিক্রী করচে, গোপালনগর থেকে হয়তো যুগল ও হাজ্‌রা ময়রা তাদের তেলে-ভাজা জিবে গজা ও জিলিপীর দোকান নিয়ে এসেচে।

বাবার সেই শ্লোকটা—অনেক কালের সেই আমবনের ছায়ায় উচ্চারিত শ্লোকটা আজও আমার মনে আছে। পুরানো খাতাখানা আজও আছে, নষ্ট হয়নি।

সকালবেলা। নেড়াদের ছাদে বসে লিখ্‌চি। গ্রীষ্মের ছুটীতে গ্রামে এসেচি।

বাস্তবিকই গ্রামের লোকের সংকীর্ণতা এত বেশী—মনকে বড় পীড়া দেয়। এদের মন চারিধার থেকে শৃঙ্খলিত—খুল্‌বার অবকাশ নেই। আবালবৃদ্ধবণিতার এই দশা দেখ্‌চি। এদের আচার শুষ্ক ও সৌন্দর্য্যবর্জ্জিত —স্বাস্থ্যনীতির সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই।

কাল বিকেলে নদীর ধারে গিয়ে অনেকক্ষণ একলা বসে ছিলাম। বাংলা দেশের, বিশেষ করে আমাদের অঞ্চলের প্রকৃতির এই যে সৌন্দর্য্য—এ অন্য ধরণের। কিছুদিন আগে আমি উড়িষ্যায় গিয়ে সেখানকার বন পাহাড়ের সৌন্দর্য্যের কথা যা লিখেছিলাম—এখানে বসে মনে বিচার করে দেখে আমি বুঝ্‌লাম তার অনেক কথা আমি ভুল লিখেছিলাম। বাংলার সৌন্দর্য more tropical—এখানে অল্প একটু স্থানের মধ্যে যত বিভিন্ন শ্রেণীর গাছপালা ও লতা আছে—ওসব দিকে তা নেই। এখানে বৈচিত্র্য বেশী। নীল আকাশ ওখানেও খোলে—মনে অন্যরকম ভাব আনে, তা মহনীয়, বিরাট—এ কথা ঠিকই। কিন্তু বাংলার আকাশ—বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের কি গ্রাম্য নদীর উপরকার যে আকাশ—তার সৌন্দর্য্য মনে অপূর্ব্ব শিল্পরসের সৃষ্টি করে—মনে

বৈচিত্র্য আনে। হয়তো বিরাটতা নেই, ঠিকই—কিন্তু Poetry of Life এতে যেন বেশী। বাঁশগাছে ও শিমুলগাছে এ দেশের, বিশেষ করে আমাদের এই অঞ্চলের, সৌন্দর্য্যকে এক অভিনব রূপ দিয়েচে। জ্যৈষ্ঠ মাসে এর সঙ্গে গ্রামে জোটে কচি উলুবন ও আউশ ধানের ক্ষেত। এত সবুজের সমাবেশ আর কোথাও দেখিনি—a feast of green—তবে গ্রামের মধ্যে মুক্ত আকাশ বড় একটা দেখা যায় না,—ওই একটা দোষ। বড় চাপা। কিন্তু মাঠে, নদীর ধারে—মুক্তরূপা প্রকৃতি যেমনি লীলাময়ী তেমনি রূপসী। উদার প্রান্তর, উদার আকাশ—নানাবর্ণের মেঘের মেলা অস্তদিগন্তে, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মেঘ-চাপা গোধূলির আলোয় গাছে, পালায়, শিমুলগাছের মাথায়, নদীজলে, উলুখড়ের মাঠে কি যে শোভা!…

একথা জোর করে বল্‌তে পারি বিক্রমখোলের পাহাড় ও বনের ওপারে যে আকাশ দেখেছিলাম—মাধবপুরের চরের ওপারের বৈকালের আকাশ তার চেয়ে মনে অনেক বেশী বিচিত্রভাবের সৃষ্টি করে।

এইমাত্র নাগপুর শহরের চতুষ্পার্শবর্ত্তী মালভূমিতে মোটরে বেড়িয়ে ফিরে এলাম। একথা ঠিকই যে বাংলায় রূপ যতই সুন্দর হোক্, বিরাটতায় ও গম্ভীর মহিমায় এসব দেশের কাছে তা লাগে না। উড়িষ্যার বন পাহাড়ের সৌন্দর্য্যের চেয়েও এর সৌন্দর্য্য বিরাট ও majestic. বাংলা দেশের রূপ নিতান্তই নিরীহ পল্লীবধূর মত লাবণ্যময়ী, লাজুক টিপপরা ছোট্ট মুখটী। কিন্তু এদেশের highland—এর রূপ গর্ব্বদৃপ্ত সুন্দরী রাজরাণীর মত।

"Pure Logical thinking can give us no knowledge whatever of the world of experience. The knowledge of Reality begins with experience and terminates with it. Reason gives the structure to the system and the data of experience and their mental relations are to correspond exactly with the consequences in the theory."

Einstein,

Herbert Spencer Lecture, Oxford, 1933.

Lucian's Satires,

Celsas (178 A.D.) writes :—

"Christians are like a council of frogs in a marsh. Their teachers are mainly weavers and cobblers, who have no power over men of education and taste. The qualification for conversion are ignorance, and childish timidity. Like all quacks they gather a crowd of slaves, children, women and idlers."

Senecca—Economy,

"He is born to serve but few, who thinks only the people of his own age. Many thousands of years, many generations of men are yet to come : look to these, though from some cause silence has been imposed on all of your own day ; then will come those who may judge without offence and without favour."

[আমি 'অপরাজিত'-র এক স্থানে অবিকল এই ভাবই ব্যক্ত করেচি। অনেক পূর্ব্বেই করেচি—তখন তো আমি সেনেকার এ উক্তিগুলি পড়ি নি—কিন্তু কি চমৎকার মিল আছে !]

অনেকদিন লিখিনি, মনেও ছিল না। হঠাৎ আজ মনে হোল তাই সামান্য এতটুকু লিখে রাখলাম। আজকার তারিখটা অন্ততঃ খাতায় থাকুক্।

আজ বৈকালে নাগপুর এসে পৌঁছেচি। এবার পূজোয় এখানেই আস্‌বো ঠিক করে রেখেছিলাম। আজ সারাদিন গাড়ীর ঝাঁকুনিতে বড় কষ্ট হয়েচে। গত মাসকয়েক আগে যে বেলপাহাড়ে এসেছিলাম সে ষ্টেশনটা আজ রাতে—শেষ রাতে বেরিয়ে চলে গেছে, দেখ্‌তে পাই নি। বিলাসপুর পর্য্যন্ত তো বেশ এলাম। বিলাসপুর ষ্টেশনে আমরা চা খেলাম। বিলাসপুর ছাড়িয়ে নাগপুর পর্য্যন্ত প্রায় একই একঘেয়ে দৃশ্য—সীমাহীন সমতলভূমি এক চক্রবালরেখা থেকে অন্য চক্রবালে পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দৃশ্য বড় একঘেয়ে, প্রায়ই

ধানের ক্ষেত ও জলাভূমি—মাঝে মাঝে ছোট ছোট শালবন। রাঙামাটিও সব জায়গায় নেই। বেলপাহাড়ের মত পাহাড় ও জঙ্গল এ পথে কোথাও নেই—এক ডোঙ্গরগড় ছাড়া। ডোঙ্গরগড় ছাড়িয়ে তিন-চারটা ষ্টেশন পর্য্যন্ত দৃশ্য ঠিক আমি যা চাই তাই। উভয় পাশে ঘন অরণ্য, শাল, খয়ের ও বন্যবাঁশ, মাঝে মাঝে পাহাড়ী নদী, পর্ব্বতমালা। উড়িষ্যার বনের চেয়েও এ বন অধিকতর গভীর কিন্তু এইটুকু যা, তারপর আবার সেই একঘেয়ে সমতলভূমি—নাগপুর পর্য্যন্ত। বাংলাদেশে এত অনন্তপ্রসারী দিক্‌ চক্রবালদেশের কল্পনাও করতে পারা যায় না।

এই সব স্থানে জ্যোৎস্নারাত্রে ও অন্ধরাত্রে যে অদ্ভুত দেখ্‌তে হবে তা বুঝ্‌তে পারলাম—তবু মনে হোল বনভূমির বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য যা বাংলা-দেশে আছে, তা এসব অঞ্চলে নেই। বাংলার সে কমনীয় আপন ভোলানো রূপ এদের কৈ? এখানকার যা রূপ তা বড় বেশী রুক্ষ। অবশ্য ডোঙ্গরগড় ষ্টেশন ছাড়িয়েই যে পাহাড় পড়ে—এমন অনাবৃত শিলাস্তূপ, অত গম্ভীর-দর্শন উন্নতভূমি বাংলার কোথাও নেই একথা ঠিক—কিন্তু বাংলায় যা আছে, এখানকার লোকে তা কল্পনাও করতে পারবে না।

বৈকালে নাগপুরে কোতোয়াল সাহেবের বাংলোয় এসে উঠলাম। তারপর চা খেয়ে আমি ও প্রমোদবাবু বেড়াতে বেরুলাম। শহরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে একটা বড় পাহাড় আছে, শালবনে আবৃত, নীচে দিয়ে মোটরের পথ আছে। দু'জনে সেখানে একটা শিলাখণ্ডের ওপর গিয়ে বস্‌লাম। হাওয়া কি সুন্দর! দু'জন ভদ্রলোক পথে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁদের চেহারা দেখে আমার মারহাট্টী সেনানায়ক ভাস্কর পণ্ডিতের কথা মনে পড়লো।

সন্ধ্যাতারা উঠেচে। পাহাড়ের বনভূমি অন্ধকার হয়ে এল। দূরে বনের মাথার দিকে চেয়ে দেখলাম—ওদিকে সাতশো মাইল প্রান্তর, অরণ্য, নদী পার হয়ে তবে বারাকপুর। হাটবার, আজ রবিবার, সন্ধ্যা হয়েচে, কাঁচিকাটার পুল দিয়ে গণেশ মুচি হাট করে ফিরচে আর বল্‌তে বল্‌তে যাচ্ছে—হাটে বেগুন আজ খুব সস্তা।

—এত জায়গা থাকৃতে ও জায়গার কথা আমার এত মনে হয় কেন?

আর মনে পড়ে আমাদের পোড়ো ভিটের পশ্চিম ধারের সেই কিঅজানা গাছগুলো, যার সঙ্গে বাল্য থেকে আমার কত পরিচয়—ওগুলোর কথা মনে কল্পনা করলেই আবার আমার বারো বছরের মুগ্ধ শৈশব যেন ফিরে আসে।

কাল বৈকালে এখানকার মহারাজবাগ ও মিউজিয়াম দেখলাম। মিউজিয়মে অনেক পুরানো শিলাখণ্ড আছে—কয়েকটী খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর। বিলাসপুর জেলায় একটা ডাকাতের কাছে পাওয়া কতকগুলো তীর দেখ্‌লাম, ভারী কৌতূহলপ্রদ জিনিস বটে। একটী জীবন্ত অজগর সাপ দেখা গেল। মহারাজবাগে একটা বড় সিংহ আছে, কিন্তু সে-সব যতই ভাল লাগুক, সে-সব নিয়ে আজ লিখ্‌বো না। আজ যা নিয়ে লিখতে বসেচি, তা হচ্চে আজকার বিকেলের মোটর ভ্রমণটী।

নাগপুর শহরের চারিধারে যে এমন অদ্ভুত ধরণের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট স্থান আছে, সে-সব কথা আমি কখনও জানতুম না। কেউ বলেও নি। শহরের উত্তর দিকে পাহাড়ের ওপরকার রাস্তা দিয়ে আজ আমরা মোটর নিয়ে গিয়েছিলাম। যোধপুরী ছাত্রটী আমাদের নিতে এসেছিল। সে যে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, তা লিখে প্রকাশ কর্ত্তে পারি নে। সন্ধ্যা হয়ে আস্‌চে অস্তদিগন্ত রঙে রঙে রঙীন্। বহুদূরে, দূরে, উচ্চ মালভূমির সুদূর প্রান্ত সান্ধ্যছায়াচ্ছন্ন, দিক্‌চক্রবালরেখা নীল শৈলমালায় সীমাবদ্ধ, সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে যেদিকে ধূ ধূ বৃক্ষহীন, অন্তহীন উচ্চাবচ মালভূমি, শৈলমালা, শিলাখণ্ড,—দু'চারটা শালপলাশের গাছ। মাথার উপর অপূর্ব্ব নীল আকাশ, ঈষৎ ছায়াভরা কারণ সন্ধ্যা হয়ে আস্‌চে—পিছনের পাহাড়টী ক্রমে গাড়ীর বেগে খুব দূরে গিয়ে পড়্‌চে তার ওপরকার বৃক্ষশ্রেণী ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আস্‌চে—সাম্‌নের শৈলমালা ফুটে উঠ্‌ছে—ক্রমে অনেক দূরে সিতাবল্‌ডির পাহাড় ও বেতার টেলিগ্রাফের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। তার নীচে চারিদিকের মালভূমি ও পাহাড়ে ঘেরা একটা খাঁজের মধ্যে নাগপুর শহরটা। এমন একটা মহিমময় দৃশ্যের কল্পনা আমি জীবনে কোনোদিনই কর্ত্তে পারি নি—বাংলাদেশ এর কাছে লাগে না—এর সৌন্দর্য্য যে ধরণের অনুভূতি ও পুলক মনে জাগায়, বাংলাদেশের মত ভূমিসংস্থান যে সব দেশে, সে সব দেশের অধিবাসীদের পক্ষে তা মনে কল্পনা করাও শক্ত। উড়িষ্যার দৃশ্যও এর কাছে ছোট বলে মনে হয়—সেখানে জঙ্গল আছে, বুনো বাঁশের ঝাড় আছে বটে, কিন্তু এ ধরণের অবর্ণনীয় সুমহান্, বিরাট, রুক্ষ সৌন্দর্য্য সেখানকারও নয়। তখন আমি এসব দেখি নি, কাজেই উড়িষ্যাকেই ভেবেছিলাম এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের চরমতম সৃষ্টি। আমি বনশ্রী খুব ভালবাসি, বন না থাক্‌লে আমার চোখে সে সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যই নয়—কিন্তু বন না

থাক্‌লেও যে এমন অপূর্ব্ব রূপ খুলতে পারে, এমন Superb অনুভূতি মনে জাগাতে পারে তা আমার ধারণাও ছিল না।

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেচে। এখানে পাহাড়ের ওপর দুটো বড় হ্রদ আছে, একটার নাম আম্বাজেরী আর একটার নাম কি বল্লে যোধপুরী ছাত্রটি ঠিক বুঝতে পারলাম না। দুটোই বড় সুন্দর—অবিশ্যি আম্বেজেরী হ্রদটা অনেক বড় ও সুন্দরতর। হ্রদের সাম্‌নে কল্‌কাতার ঢাকুরে লেক্‌কে লজ্জায় মুখ লুকাতে হয়। এর গম্ভীর মহিমার কাছে ঢাকুরিয়া লেক্ বাল্মিকীর কাছে ভারতচন্দ্র রায়। এর কি তুলনা দেবো? ম্লান জ্যোৎস্না উঠ্‌ল। যোধপুরী ছাত্রটী লোক ভাল, কিন্তু তার দোষ সে অনবরত বক্‌চে। প্রমোদবাবু তার নাম রেখেচেন 'মূলো'—সে চুপ করে থাক্‌লে আমরা আরও অনেক বেশী উপভোগ কর্ত্তে পারতুম।

আস্‌বার পথটিও বড় চমৎকার—পথ ক্রমে নেমে যাচ্চে—দু'ধারে সেই রকম immensity. মনে হোল আজ পূজার মহাষ্টমী—দূর বাংলাদেশের পল্লীতে পল্লীতে এখন এই সন্ধ্যায় মহাষ্টমীর আরতি সম্পন্ন হয়ে গেছে, প্রাচীন পূজার দালানে নতুন জামা-কাপড় পরে ছেলেমেয়েরা মুড়ি-মুড়কী, নারকেলের নাড়ু কোঁচড়ে ভরে নিয়ে খেতে খেতে প্রতিমা দেখ্‌চে। বারাকপুরের কথা, তার ছায়াঘেরা বাঁশবনের কথাও এ সন্ধ্যায় আজ আবার মনে এল। সজ্‌নে গাছটার কথাও—সেই সজ্‌নে গাছটা।

মহাষ্টমীতে আজ ক্র্যাডক্-টাউনে প্রবাসী বাঙ্গালীদের দুর্গোৎসব দেখতে গিয়েছিলাম। নাগপুরে বাঙ্গালী এত বেশী তা ভাবি নি। ওরা প্রসাদ খাবার অনুরোধ কর্‌লে—কিন্তু নীরদবাবুকে রুগ্ন অবস্থায় বাসায় রেখে আমরা কি করে বেশীক্ষণ থাকি?

মারাঠী মেয়েরা রঙীন শাড়ী পরে সাইকেলে চেপে ঠাকুর দেখতে যাচ্চে। আমরা মহারাজবাগের মধ্যের রাস্তা দিয়ে এগ্রিকাল্‌চারাল কলেজের গাড়ী-বারান্দার নীচে দিয়ে ভিক্টোরিয়া রোডে এসে পৌছুলুম। রাত সাড়ে সাতটা, জ্যোৎস্না মেঘে ঢেকে ফেলেচে।

সেদিন বনগাঁয়ে ছকু পাড়ুইর নৌকাতে সাতভেয়েতলা বেড়াতে গিয়েছিলাম—এবার বর্ষায় ইছামতী কূলে কূলে ভরে গিয়েচে—দু'ধারের মাট ছাপিয়ে জল উঠেচে—তারই ধারের বেতবন, অন্যান্য আগাছার জঙ্গল বড় ভাল লেগেছিল। অত সবুজ, কালো রংয়ের ঘন সবুজ,—বাংলা ছাড়া আর

কোথাও দেখা যাবে না, বনের অত বৈচিত্র্য ও রূপ কোথাও নেই—নীল আকাশের তলায় মাঠ, নদী, বনঝোপ বেশ সুন্দর লেগেছিল সেদিন। কিন্তু আজ মনে হোল সে যত সুন্দর হোক্, তার বিরাটতা নেই—তা pretty বটে, majestic নয়।

চারিধারে জঙ্গলাবৃত—গাছপালার মধ্যে হ্রদটা। হ্রদের বাংলোতে বসে লিখ্‌চি। প্রমোদবাবু বল্‌চেন, সূর্য্য ঢলে পড়েচে শীগ্‌গির লেখা শেষ করুন। এখান থেকে আমরা এখন রামটেক্ যাবো। কি গভীর জঙ্গলটাতে এইমাত্র বেড়িয়ে এলাম—বুনো শিউলি, কেঁদ, আবলুস, সাঁইবাবলা সব গাছের বন। সামনে যতদূর চোখ যায় নীল পর্ব্বতমালা বেষ্টিত বিরাট হ্রদটা। এমন দৃশ্য জীবনে খুব কমই দেখেচি। পাহাড়ে যখন মোটরটা উঠল—তখনকার দৃশ্য বর্ণনা করবার নয়। সময় নেই হাতে, তাই তাড়াতাড়ি যা তা লিখ্‌চি। সূর্য্য ঢলে পড়েচে—এখনও এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী রামটেক্ দেখ্‌তে যাবো। প্রমোদবাবু তাগাদা দিচ্চেন। বনশিউলি গাছের সঙ্গে বনতুলসী গাছও আছে—কিন্তু তা পাহাড়ের বাইরে ঢালুতে। একটা সুন্দর গন্ধ বেরুচ্চে। মোটরওয়ালা কোথায় গিয়েচে—হর্ণ দিচ্চি—এখনও খোঁজ পাই নি। পাহাড়ের গায়ে ছায়া পড়ে এসেচে। দূরের পাহাড় নীল হতে নীলতর হচ্চে। এখানে হ্রদের সাজানো বাঁধানো সিঁড়ি ভেঙে জল সংগ্রহ করা অত্যন্ত কষ্টকর। বাংলোয় চৌকীদারের কাছ থেকে জল চেয়ে দু'জনে খেলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা হয় হয়। ড্রাইভারটা কোথায় ছিল—হর্ণ দিতে দিতে এল। প্রমোদবাবু ছড়ি ফেলে এসেচেন—হ্রদের ঘাটে নেমে আন্‌তে গেলেন। ফিরে বল্লেন—ছায়া আরও নিবিড়তর হয়েছে বনের মধ্যে। অপরাহ্নের ছায়ায় বন আরও সুন্দর দেখাচ্চে। ওখান থেকে মোটর ছেড়ে শৈলমালাবৃত সুন্দর পথে রামটেক্ এলাম। রামটেকে যখন এসেচি, তখন বেলা আর নেই, সূর্য্য অস্ত গেছে। অপরাহ্নের ছায়ায় রামটেকের সুবৃহৎ উপত্যকা ও ছায়াচ্ছন্ন অরণ্যাবৃত শান্ত অধিত্যকাভূমির দৃশ্য আমাদের কাছে এতই অপ্রত্যাশিত ভাবে সুন্দর মনে হোল যে, আমি মনে মনে বিস্মিত হয়ে গেলাম—এই সুগুর গিরিসানুদেশ এখনি জ্যোৎস্নায় শুভ্র হয়ে উঠ্‌বে, এই নির্জ্জনতা, সেই প্রাচীন দিনের স্মৃতি—এসব মিলে এখনি একে কি অপরূপ রূপই দেবে—কিন্তু আমরা এখানে পৌঁছতে দেরী করে ফেলেচি, বেশীক্ষণ এই ছায়াভরা ধূসর সানুশোভা উপভোগ কর্ত্তে তো পারবো না! পথ

খুব চওড়া পাথরে বাঁধানো—কিন্তু উঠেই চলেচি, সিঁড়ি আর শেষ হয় না। প্রথমে একটা দরজা, সেটা এমন ভাবে তৈরী যে দেখ্‌লে প্রাচীন আমলের দুর্গদ্বার বলে ভ্রম হয়। তারপর আর একটা দরজা, তারপর আর একটা—সর্ব্বশেষে মন্দির। মন্দিরে প্রবেশ করে বহিরাঙ্গণের প্রাচীরের ওপরকার একটা চবুতারায় আমরা বস্‌লাম। নীচেই বাঁ ধারে কিন্‌সী হ্রদ, পূবে পূর্ণচন্দ্র উঠ্‌চে, চারিধারে থৈ থৈ করচে বিরাট space, পশ্চিম আকাশ এখনও একটু রঙীন্। মন্দিরে আরতির সময়ে এখানে নহবৎ বাজে, এক ছোক্‌রা বাইরে পাঁচীল ঠেস্ দিয়ে বসে সানাই বাজাতে শুরু করলে। আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

একটু পরে জ্যোৎস্না আরও ফুট্‌ল। আমাদের আর উঠ্‌তে ইচ্ছে করে না, প্রমোদবাবু তো শুয়েই পড়েচেন। দূরে পাহাড়ের নীচে আম্বারা গ্রামের পুকুরটাতে জ্যোৎস্না পড়ে চিক্ চিক্ করচে। মন্দির দেখ্‌তে গেলাম। খুব ভারী ভারী গড়নের পাথরের চৌকাঠ, দরজার ফ্রেম—সেকেলে ভারী দরজা পেতলের পাত দিয়ে মোড়া, মোটা গুল্ বসানো। মন্দিরের দু'পাশে ছোট ছোট ঘর, পরিচারক ও পূজারীরা বাস করে। তাদের ছেলেমেয়েরা খেলা-ধূলো করচে, মেয়েরা রান্নাবাড়া করচে। রামসীতার মন্দিরের দরজার পাশে অনেকগুলি সেকেলে বন্দুক ও তলোয়ার আছে। একজনকে বল্লুম—এত বন্দুক কার? সে বল্লে—ভোঁস্‌লে সরকারকা। ১৭৮৩ সালে রঘুজী ভোঁস্‌লা এই বর্ত্তমান মন্দির তৈরী করেন। আম্বারা সরোবরের পাশে ভোঁস্‌লাদের বিশ্রামাবাসের ধ্বংসাবশেষ আছে, আস্‌বার সময় দেখে এসেচি। মন্দিরের পিছনের একটা চবুতারায় দাঁড়িয়ে উঠে নীচে রামটেক্ গ্রামের দৃশ্য দেখ্‌লাম—বড় সুন্দর দেখায়! রামটেক্ ঠিক গ্রাম নয়, একটা ছোট গোছের টাউন।

মন্দির প্রদক্ষিণের পর পাহাড় ও জঙ্গলের পথে আমরা নেমে এলাম। জ্যোৎস্নার আলোছায়ায় বনময় সানুদেশ ও পাষাণ বাঁধানো পথটা কি অদ্ভুত হয়েচে। এখানে বসে কোনো ভাল বই পড়বার কি চিন্তা করবার উপযুক্ত স্থান। এর চারিধারেই অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য্যময় গলিঘুঁজি, উচ্চাবচ ভূমি, ছায়াভরা বনান্ত দেশ। আমার পক্ষে তো একেবারে স্বর্গ। ঠিক এই ধরণের স্থানের সন্ধানই আমি মনে মনে করেচি অনেকদিন ধরে। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের থেকে এর সৌন্দর্য্য অনেক বেশী, যদিও চন্দ্রনাথের মত এ পাহাড় অতটা উঁচু নয়। আম্বারা গ্রামটী আমার বড় ভাল লাগ্‌ল—চারিধারে

একেবারে পাহাড়ে ঘেরা, অনেকগুলি ছোট ছোট দোকান, গোলার ঘর, একটা সরাইও আছে। ইচ্ছে হোলে এখানে এসে থাকাও যায়। আমরা খুব তাড়াতাড়ি নামতে পারলাম না, যদিও প্রতিমুহূর্ত্তে ভয় হচ্ছিল, মোটর ড্রাইভার হয়তো কি মনে করবে। বেচারী সারাদিন কিছু খায় নি। আমার গ্রামটা দেখ্‌বার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার সময় ছিল না, তাড়াতাড়ি মোটর ছেড়ে সেই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে, কাটা পথটা ঘুরে রামটেক্ টাউনের মধ্যে ঢুকল। পাহাড়ের ঢালুতে বন্য আতাবৃক্ষ অজস্র, এখানে বলে সীতাফল—নাগপুর শহরে যত আতাওয়ালী আতা ফিরি করে—তার সব আতাই ফলে সিউনি ও রামটেক্ পাহাড়ে।

রাত বোধ হয় ৭টা কি ৭॥ টা। মন্দিরের ওপরে চবুতারায় বসে দূরে নাগপুরের বৈদ্যুতিক আলোকমালা দেখেছিলাম ঠিক সন্ধ্যায়—তাই নিয়ে প্রমোদবাবুর সঙ্গে তর্ক হোল, আমি বল্লুম—ও কাম্‌টির আলো—প্রমোদ বাবু বল্লেন—না, নাগপুরের।

কিন্‌সী হ্রদের বাংলোতে খাবার খেয়েছিলাম, কিন্তু চা খাইনি। রামটেকের মধ্যে ঢুকে একটা চায়ের দোকানে আমরা গাড়ীতে বসে চা খেলাম। খুব জ্যোৎস্না উঠেচে—রামটেকের পাহাড়ের ওপর সাদা মন্দিরটা জ্যোৎস্নায় বড় চমৎকার দেখাচ্চে—চা খেতে খেতে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। আজ কোজাগরী পূর্ণিমা, এতক্ষণ বারাকপুরে আমার গাঁয়ে বাড়ীতে বাড়ীতে শাঁক বাজচে। লক্ষ্মীপূজোর লুচিভাজার গন্ধ বার হচ্চে বাঁশবনের পথে—এতদূর থেকে সে-সব কথা যেন স্বপ্নের মত লাগে। রামটেকের পথ দিয়ে মোটর ছুট্‌ল। কিন্‌সী হ্রদ থেকে মোটরে আস্‌বার সময়ে যেমন আনন্দ পেয়েছিলাম, তেমনি আনন্দ পেলাম। সামনে তখন ছিল আঁকাবাঁকা, উঁচুনীচু পার্ব্বত্য প্রদেশের কঙ্করময় পথ, ডাইনে ছায়াবৃত অরণ্যেভরা শৈলমালা—এখন ঠিক তেমনি পথ দিয়ে মোটর তীরের বেগে ছুঠে চলেচে—প্রমোদবাবু বল্লেন, a glorious drive.

রামটেক্ ষ্টেশনে নাগপুরের ট্রেণখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে, সুতরাং বোঝা গেল এখনও সাড়ে আটটা বাজে নি।। একটু গিয়ে প্রমোদবাবু মাইল ষ্টোনে পড়লেন—নাগপুর ২৮ মাইল, মান্‌সার ২ মাইল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ডাইনে মান্‌সারের বিরাট ম্যাঙ্গানিজের পাহাড় পড়ল—জ্যোৎস্নার আলোতে সুউচ্চ অনাবৃতকায় পাহাড়গুলো যেমনি নির্জ্জন, তেমনি বিশাল ও বিরাট

মনে হচ্ছিল। মনে ভাবছিলাম ওই নির্জ্জন শৈলশিখরে, এই ঘন বনের মধ্যের পথ দিয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় তাঁবু খাটিয়ে যারা রাত্রিযাপন করে একা একা, তাদের জীবনের অপূর্ব্ব অনুভূতির কথা। আরও ভাবছিলাম এই জ্যোৎস্নায় বহুদূরের বাংলাদেশের এক ছোট্ট নদীর ধারের গ্রামের একটা দোতালা বাড়ীর কথা। ভাবলাম, অনেকদিন হয়ে গেছে বটে, কিন্তু সে এখন আরও কাছে কাছে থাকে—যখন খুশি সেখানে যেতে পারে—হয়তো আজ এই জ্যোৎস্নারাত্রে আমার কাছে কাছেই আছে। মান্‌সারে যেখানে নাগপুর জব্বলপুর রোড থেকে রামটেকের পথটা বেঁকে এল—সেখানে একটা P. W. D. বাংলো আছে, সাম্‌নে একটা পদ্মফুলে ভরা জলাশয়। স্থানটী অতি মনোরম। দুপুরে আজ এই ম্যাঙ্গানিজগুলি আমরা দেখে গিয়েছিলাম—বিরাট পর্ব্বতের ওপর মোটর উঠিয়ে নিয়ে গেল।—অনাবৃতদেহ পর্ব্বতপঞ্জর রৌদ্রে চক্‌চক্ করচে, খাড়া কেটে ধাতু-প্রস্তর বার করে দিয়েচে—সামনে schist ও granite—নীচের স্তরগুলোতে কালো ম্যাঙ্গানিজ। একজন ওদেশী কেরানী আমাদের সব দেখালে, সঙ্গে দু' টুক্‌রো ম্যাঙ্গানিজ দিলে কাগজচাপা করবার জন্যে। তারই মুখে শুন্‌লাম এই ম্যাঙ্গানিজ স্তর এখান থেকে ২৫।২৬ মাইল দূরে ভাণ্ডারা পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে—মাঝে মাঝে সমতল জমি, আবার পাহাড় ঠেলে ঠেলে উঠেচে। নাগপুর-জব্বলপুর রোডে অনেক পাহাড় পড়ে জব্বলপুরে যেতে। সিউনির দিকেও পাহাড় ও জঙ্গল মন্দ নয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দৃশ্য নাগপুর-অমরাবতী রোডে। নাগপুর শহর থেকে ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী বাজারগাঁও গ্রাম থেকে কান্‌হোলি ও বোরি নদীর উপত্যকাভূমি ধরে যদি বরাবর সোজা উত্তর-পশ্চিম দিকে যাওয়া যায়, তা হোলে শৈলমালা, মালভূমি ও অরণ্যে-ঘেরা এক অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হবে।

মান্‌সার ছেড়ে আমরা নাগপুর-জব্বলপুর রোডে পড়লাম। দু'ধারে দূরপ্রসারী সমতলভূমি জ্যোৎস্নায় ধূ ধূ করচে—আকাশে দু'দশটা নক্ষত্র—দূরে নিকটে বৃক্ষশ্রেণী। এখনও নাগপুর ২৫ মাইল। সারাদিন পাহাড়ে ওঠানামা পরিশ্রমের পর, হু হু ঠাণ্ডা বাতাস বেশ আরামপ্রদ বলে মনে হচ্চে। ক্রমে কাম্‌টি এসে পড়লাম। পথে কান্‌হান্ নদীর সেতুর ওপর এসে মোটরের এঞ্জিন বিগড়ে গেল। আমরা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নদীবক্ষের দিকে চেয়ে আর একটা সিগারেট ধরালাম। পেছনে রামটেক্ প্যাসেঞ্জার

ট্রেণখানা কান্হান্ ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে—আমার ইচ্ছে ছিল ট্রেণে মোটরে একটা রেস্ হয়—কিন্তু তা আর হোল না, ট্রেণ ছাড়বার আগেই মোটরের এঞ্জিন ঠিক হয়ে গেল। কাম্‌টিতে এঞ্জিন আবার বিগ্‌ড়ালো এবার কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ঠিক হোল। তারপর আমরা নাগপুর এসে পড়লাম—দূর থেকে ইন্দোরের আলো দেখা যাচ্চে।

কিন্তু কিন্‌সী হ্রদের তীরের গিরিসাপুর জঙ্গল আমি এখনও ভুলি নি। শরতের নীল আকাশের তলায় সেই নিবিড় ছায়ানিকেতন আরণ্য প্রদেশটী আমার মনে একটা ছাপ দিয়ে গেছে। আহা! ঐ বনের শিউলী গাছগুলোতে যদি ফুল ফুট্‌তো, আরও যদি দু'চার ধরণের বনফুল দেখতে পেতুম—তবে আনন্দ আরও নিবিড় হোত—কিন্তু এমনি কত দেখেচি, তার তুলনা নেই। বুনো বাঁশের ছোট ছোট ঝাড়গুলির কি শ্যামল শোভা! পূজোর ছুটি ফুরিয়ে যাবে, আবার কল্‌কাতার লোকারণ্যের মধ্যে ফিরে যাবো, আবার দশটা পাঁচটা স্কুলে ছুট্‌বো, আবার অপকৃষ্ট 'ক্যালকাটা কেবিনে' বসে চা ও ডিমের মামলেট খাবো—তখন এই বিশাল পার্ব্বত্যকায় সরোবর, এই শরতের রৌদ্রছায়াভরা কটুতিক্ত গন্ধ ওঠা ঘন অরণ্যানী, এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জ্জন গিরিসানু—এই আম্বারা, কিন্‌সী, রামটেকের মন্দির-দুর্গ—এসব বহুকাল আগে দেখা স্বপ্নের মত অস্পষ্ট হয়ে মনের কোণে উঁকি মারবে।

একটা কথা না লিখে পারচি নে। আমি তো যা দেখি, তাই আমার ভাল লাগে—বিশেষ করে যদি সেখানে বন থাকে। কিন্তু তবুও লিখ্‌চি আমি এপর্য্যন্ত যত পাহাড় ও অরণ্য দেখেচি—চন্দ্রনাথ, ত্রিকূট, কাট্‌নি অঞ্চলের পাহাড়—ডিগ্‌রিয়া ও নন্দন পাহাড়ের উল্লেখ করাই এখানে হাস্যকর, তবুও উল্লেখ করচি এইজন্যে যে, এই ডায়েরীতেই কয়েক বছর আগে আমি নন্দন পাহাড়ের সুখ্যাতি করে খুব উদ্দামপূর্ণ বর্ণনা লিখেচি—এসব পাহাড় কিন্‌সী ও রামটেকের কাছে ম্লান হয়ে যায় সৌন্দর্য্য ও বিশালতায়।

কাল নাগপুর থেকে চলে যাবো। আজ রাত্রে নির্জ্জন বাংলোয় বারান্দাতে বসে জ্যোৎস্নাভরা কম্পাউণ্ডের দিকে চেয়ে শরৎচন্দ্র শাস্ত্রীর 'দক্ষিণাপথ ভ্রমণ' পড়চি। সেই পুরোনো বইখানা সিদ্ধেশ্বর বাবুদের আফিসে কাজ করবার সময় টেবিলের ড্রয়ারে যেখানা লুকোনো থাক্‌ত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চট্ করে একবার বার করে নিয়ে পাহাড়, জঙ্গল, দূরদেশের

বর্ণনা পড়ে ক্লান্ত ও রুদ্ধশ্বাস চেতনাকে চাঙ্গা করে নিতুম। এখনও মনে পড়চে সেই ছোট টেবিলটা তার ড্রয়ারটা, ডাইনে কাঠের পার্টিসনটা সেই রোকড় খতিয়ানের স্তূপ, ফাইলের বোঝা।

কাল বৈকালে একা বেড়াতে বার হয়েছিলাম, কারণ সকালে বম্বে মেলে প্রমোদবাবু হাওড়া ফিরলেন। আমি তাঁকে তুলে দিতে গিয়েছিলাম। একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের সঙ্গে ট্রেণে আলাপ হোল, তাঁর বাড়ী খড়গপুর, তিনি মতিকাকাকে চেনেন। বল্লুম, মতিকাকার কাছে আমার নাম বল্‌বেন।

তারপর বৈকালে একা বার হলাম। South Tiger Gap Road দিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে একটা মুক্ত জায়গায় শাঁকোর ওপর বসলাম। সাম্‌নে ধূ ধূ প্রান্তর দূরে দূরে শৈলশ্রেণী—বাঁয়ে সাতপুরা, ডাইনে রামটেকের পাহাড় ও মান্‌সারের ম্যাঙ্গানিজের পাহাড় অস্পষ্ট দেখা যাচ্চে। একটু পরে সূর্য্য ডুবে গেল, পশ্চিম দিগন্তে কত কি রঙ্ ফুট্‌ল। আমার কেবলই মনে আস্‌তে লাগ্‌ল ঐ শ্লোকটা—'প্রস্থিতা দূরপন্থানং'...শ্লোকের টুক্‌রাটার নতুন মানে এখানে বসেই যেন খুঁজে পেলাম। ভাব্‌লাম আমার উত্তর পূব কোণে, আরও অনেক পেছনে কাশী ও বিন্ধ্যাচল, মৃজাপুর ও চূণার পড়ে আছে—পশ্চিম ঘেঁসে প্রাচীন অবন্তী জনপদ—পূর্ব্বে প্রাচীন দক্ষিণ কোশল, সাম্‌নের ঐ নীল শৈলমালা—যার অস্পষ্ট সীমারেখা গোধূলির শান্ত ছায়ায় অস্পষ্ট দেখা যাচ্চে—ঐ হলো মহাভারতের কিংবা নৈষধ চরিতের সেই ঋক্ষবাণ্ পর্ব্বত। এই যেখানে বসে আছি, এখান থেকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে অমরাবতীর কাছে পদ্মপুর বলে গ্রামে কবি ভবভূতির জন্মস্থান। এ সব প্রাচীন দিনের স্মৃতি জড়ানো প্রান্তর, অরণ্য, শৈলমালা, দিগন্তহীন মালভূমির গম্ভীর মহিমা, এই রকম সন্ধ্যায় নির্জ্জনে বস্‌লেই মনকে একেবারে অভিভূত করে দেয়।

পূর্ব্বে চেয়ে দেখি হঠাৎ কখন পূর্ণচন্দ্র উঠে গেছে। তারপর জ্যোৎস্না শোভিত Tiger Gap Road-এর বনের ধার দিয়ে শহরে ফিরে এলাম। শরতের রাত্রের হাওয়া বন্য শিউলির সুবাসে ভারাক্রান্ত ও মধুর। Lawrence Road-এর মোড়ে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম—তিনজন বাঙ্গালী ছোক্‌রার সঙ্গে দেখা—তারা আমায় বাংলোর কাছে পৌছে দিয়ে গেল।

আমি ওখান থেকে চলে গেলাম সীতাবল্‌ডির বাজারে ঘড়ির দোকানে। সেখানে রেডিওতে কল্‌কাতা Short Wave ধরেচে, বাংলা গান বাজ্‌চে—

একটু পরে রেডিও ষ্টেশনের বিষ্ণু শর্ম্মা সুপরিচিত গলায় কি একটা গানের ঘোষণা করলে। মনে মনে ভেবে দেখলাম কত পাহাড় জঙ্গল পার হয়ে ৭৫০ মাইলে ব্যবধান ঘুচিয়ে বিষ্ণু শর্ম্মার গলা এখানে এসে পৌঁছুলো—যে মুহূর্ত্তে সে গার্ষ্টিন প্লেসের সেই রাঙা বনাত মোড়া ঘরটায় বসে একথা বল্লে, সেই মুহূর্ত্তেই! রেডিওর অদ্ভুতত্ব এভাবে কখনো অনুভব করি নি—কল্‌কাতায় বসে শুন্‌লে এর গভীর বিস্ময়ের দিকটা মনে আসে না।

তারপর টাঙা নিয়ে নেরুলকরের ওখানে গেলাম। ডাক্তার বেরিয়ে গিয়েচে—বসে বসে 'The Story of the Mount Everest' বইখানা পড়লাম—রাত দশটা বাজে, এখনও ডাক্তার এল না। আমি একটা চিঠিতে লিখে এলাম, কাল সকালে দুবেকে সঙ্গে নিয়ে যেন নেরুলকর আমাদের ওখানে আসে। তারপর একটা টাঙা নিয়ে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ষ্টেশন দিয়ে ফিরলাম।

সকালে সীতাবল্‌ডির ঘড়ির দোকানে ঘড়ি সারাতে গেলাম—ওখান থেকে গেলাম ডাঃ নেরুলকরের ওখানে ও ষ্টেশনে বার্থ রিজার্ভ করতে। দুপুরে মিউজিয়ামে গিয়ে গোঁড় জাতির অস্ত্রশস্ত্র, বালাঘাট পার্ব্বত্যদেশের খনিজ প্রস্তর fosil, জব্বলপুরের অধুনালুপ্ত অতিকায় হস্তী, নর্ম্মদার উত্তরে অরণ্যের অধুনালুপ্ত সিংহ, বনবিড়াল, ঝিন্দ্‌ওয়ারা জঙ্গলের বাইসন বা সৌর—কত কি দেখলাম। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের চেদীরাণী লোহলের প্রস্তরলিপি ও বৌদ্ধ রাজা সূর্য্য ঘোষের পুত্র রাজপ্রাসাদের ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে মারা যাওয়াতে ভগবান তথাগতের উদ্দেশে পুত্রের আত্মার সদ্গতির জন্য তিনি যে মন্দির নির্ম্মাণ করেন—সে লিপিটিও পড়লাম। আজ খুব রোদ, আকাশ খুব নীল, বাংলোর বারান্দায় বসে লিখ্‌চি। এখনি চা খেতে যাবো।

তারপর আমরা রওনা হলুম। ডাঃ নেরুলকর ষ্টেশনে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। ড্রুগ্ ও ডোঙ্গরগড়ের মধ্যবর্ত্তী বিখ্যাত সালাকেসা ফরেষ্ট দেখ্‌বো বলে আমরা রাত দেড়টা পর্য্যন্ত জেগে বসে রইলাম। নাগপুর ছাড়িয়ে ছোট ছোট শালের জঙ্গল অনেক দেখা গেল—জ্যোৎস্না রাত্রে প্রকাণ্ড অরণ্যটার রূপ আমার মনে এমন এক গম্ভীর অনুভূতি জাগালে—সে রাত্রে ঘুম আমার আর এল না—ডোঙ্গরগড় ষ্টেশন গাড়ী এসে পড়ল, রাত তিনটে বেজে গেল, ঘুমুবার ইচ্ছেও হোল না—জানালা থেকে চোখ সরিয়ে নিতে মন আর সরে না।

নাগপুর থেকে ফিরেই দেশে গিয়েছিলাম। ইছামতী দিয়ে নৌকোতে বিকেলের দিকে গ্রামের ঘাটে পৌছুলাম—বাল্যে একটা কি ছেলেদের কাগজে একটা কবিতা পড়েছিলাম—

'ঘাটের বাটে লাগ্‌লো যবে আমার ছোট তরী,
ঘনিয়ে আসে ধরায় তখন শীতের বিভাবরী।'

এতকাল পরে সেই দুটী চরণই বার বার মনে আসতে লাগ্‌ল। মাধবপুরের মাঠে সূর্য্য অস্ত গেল, চাল্‌তেপোতার বাঁকের সবুজ ঝোপঝাপ দেখ্‌লাম—এবার কিন্তু চোখে লাগ্‌ল না তেমন। কেন এমন হোল কি জানি ?

অবশ্য একথা ঠিক, এমন ঘন সবুজ ও নিবিড় বনসম্পদ C. P. অঞ্চলের নেই—সে হিসেবে বাংলাদেশের তুলনা হয় না ওসব দেশের সঙ্গে ; কিন্তু ভূমিসংস্থান বিষয়ে বাংলা অতি দীন। জলকাদা, ডোবা, জলা, ugly জঙ্গল, —এ বড় বেশী। লোকেও ভূমিশ্রী বর্দ্ধিত করতে জানে না, নষ্ট করতে পারে। নানা কারণে বর্ষাকালে বাংলাদেশ আদৌ ভাল লাগে না। আবার খুব ঘন বর্ষায় খুব ভাল লাগে—যেমন শ্রাবণ ভাদ্র মাসের অবিশ্রান্ত বর্ষণের দিনগুলিতে, যখন জলে থৈ থৈ করে চারিধার। শেষ শরতের এসব বর্ষায় সৌন্দর্য্য নেই, কিন্তু অসুবিধে ও শ্রীহীনতা যথেষ্ট। গাছপালায় মনকে বড় চাপা দিয়ে রাখে।

এবার কল্‌কাতায় বড় ভাল লাগ্‌চে।

কাল সাহেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েচি সারাদিন। সকালে বিশ্বনাথের মোটরে গোপালনগর গিয়েছিলাম—তারপর লাঙ্গলচষার প্রতিযোগিতা হোল, ছেলেদের দৌড় হোল—তারপর বিকেলে বেলেডাঙ্গা গেলাম। সেখানে একটা ডাব খাওয়া গেল—স্কুলে যুগল শিক্ষক এল।

দেশ, খয়রামারির মাঠ এত ভাল লাগ্‌চে এবার! কাল হারাণ চাক্‌লাদার মহাশয়ের ছেলের কৃষিক্ষেত্র দেখ্‌তে গিয়েছিলাম—মাঠের মধ্যে ফুলের চাষ করেচে—বেশ দেখাচ্ছে। একটা ঝাঁড়া গাছের কুঞ্জবন বড় সুন্দর। এবার জ্যোৎস্না খুব চমৎকার, শীতও বেশ। রোজ খয়রামারির মাঠে বেড়াই। আজ একা যাবো। একলা না গেলে কিছু হয় না।

রাজনগরের বটতলায় রোজ বেড়াতে যাই। সাম্‌নে অপরূপ রঙে রঙীন্ সূর্য্য অস্ত যায় দিগন্তের ওপারে, নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ চারিদিক—মাটীর সুঘ্রাণ স্মরণ করিয়ে দেয় ইসমাইলপুরের জনহীন চড়ায় এমন সব শীতের সন্ধ্যা, কত সুদীর্ঘ অন্ধকার রাত্রি, কত কৃষ্ণা নিশীথিনীর শেষ যামের ভাঙা চাঁদের জনমানবহীন বনের পেছনে অস্ত যাওয়া, কত নীল পাহাড় ঘেরা দিক্‌চক্রবাল, বিষম শীতের রাত্রে ঘনোরী তেওয়ারীর মুখে অদ্ভুত গল্প শোনা অগ্নিকুণ্ডের চারিধারে বসে বসে।

সে সব দিন আজকাল কতদূরের হয়ে গেছে।

আজ নববর্ষের প্রথম দিনটাতে সকালে নীরদবাবুদের সঙ্গে বহুকাল পরে বেলুড় গিয়েছিলাম। পেছনের ছাদটাতে বসে আবার পুরোনো দিনের মত কত গল্প করলাম। পেছনের ছাদটা, বেলুড়ের বাড়ীর চারিপাশের বাগান এত ভাল লাগ্‌ল। ভেবেছিলাম এখানে আর আসা হবে না। সেই বেলুড়ে আবার যখন আসা হোল,—বিশেষ করে সেই শীতকালেই, যে শীতকালের রাত্রির সঙ্গে বেলুড়ে যাপিত কত রাত্রির মধুর স্মৃতির যোগ রয়েচে—তখন জীবনের অসীম সম্ভাব্যতার উপলব্ধি করে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সবাই মিলে আমরা চড়ুইভাতি করে খেলাম নীচের রান্নাঘরটাতে। পেঁপের ডাল হাতে রদ্দুরে পিঠ দিয়ে বস্‌লাম মালীর ঘরের সাম্‌নে, নীচের ছাদটায় ফল্‌সা গাছের ডালের সেই অপূর্ব্ব অবনমন দেখ্‌লাম, যা ওই ফল্‌সা গাছটারই নিজস্ব, অন্য গাছের এ সৌন্দর্য্যভঙ্গি দেখিনি কখনো—বাগানের পাঁচীলের ওদিকে পাটের কলে নিবারণ মিস্ত্রীর সেই গোলপাতার ঘরখানা, শীতের দিনে গাঁদাফুল-ফোটা নিকানো দু'পাশে তকৃতকে উঠোন,—সব যেন পুরাতন, পরিচিত বন্ধুর মত আমাদের প্রাণে তাদের স্নেহস্পর্শ পাঠিয়ে দিলে বড় ভাল লাগ্‌ল আজ বেলুড়।

সন্ধ্যার আগেই মোটরে চলে এলাম কল্‌কাতায়। কাল গিয়েছে পূর্ণিমা, আজ প্রতিপদের চাঁদ রাত সাড়ে সাতটার পরে উঠ্‌ল। ধোঁয়া নেই, এই যা সৌভাগ্য।

অনেকদিন পরে আজ আম্‌ড়াতলার গলির মুখে গিয়ে পড়েছিলাম—এতদিন চিনিনি—আজ চিনেচি।

এবার ইষ্টারের ছুটীটা কাটাতে এলুম এখানে। সেবার এসে নীলঝর্ণার

যে উপত্যকা দেখে গিয়েছিলাম—আবার জ্যোৎস্না রাত্রে নিমফুল ও শাল-মঞ্জরীর ঘন সুবাসের মধ্যে সে সব স্থান দেখলাম। রাণীঝর্ণার পথে পাহাড়ে উঠে গোঁড় জাতির গ্রামে আবার বেড়িয়ে এলাম। আজ বেড়িয়ে এলাম সকালে কাঁকড়গাছি ঘাট। সারা পথের দু'ধারে বন, তবে এখন শাল ও মহুয়া গাছ প্রায় নিষ্পত্র—তলায় সাদা সাদা মহুয়া ফুল টুপ্ টাপ্ ঝরে পড়চে। রাখামাইন্‌স্ ছাড়িয়ে খানিকটা গেলে বন বেশ ঘন, বড় বড় ছায়াতরুও আছে। কাঁকড়গাছি ঘাটটা বড় চমৎকার,—এখানে একটা জায়গার চারিধারেই পাহাড়ের শ্রেণী। ছোট একটা ঝরণা আছে—তবে এখন ঝরণাতে জল খুবই কম। ওদিকে বনগাছের শোভা এদিকের চেয়ে সুন্দর। অপরাহ্ণে বা জ্যোৎস্নারাত্রে যে এসব স্থানের শোভা অপূর্ব্ব হবে সেটা বুঝ্‌তে পারা খুব কঠিন নয়। নীরদবাবুরা গরুর গাড়ীতে এলেন—আমি দেখলাম ওর চেয়ে হেঁটে আসা অনেক বেশী আরামের। বাংলোর সাম্‌নে ছোট বাঁধটাতে স্নান করে এলাম। জল বেশ ভাল। খুব সম্ভব আজই রাত্রে কল্‌কাতাতে ফিরবো।

কাল রাখামাইন্‌স্ থেকে বৈকালে হেঁটে আমরা তিনজন চলে এলাম শালবনের মধ্যে দিয়ে অস্তসূর্য্যের আলোয় রাঙানো স্বর্বণরেখা পার হয়ে। আজ সকালে গালুডির বাংলোর পিছনে সেই শিলাখণ্ডে বসে লিখ্‌চি। কাল রাতের চাঁদটা যে কখন কালাঝোর পাহাড় শ্রেণীর পিছন দিয়ে উঠ্‌ল তা মোটেই টের পাইনি—ষ্টেশন থেকে এসে দেখি চাঁদ উঠে গিয়েচে। কিন্তু অনেক রাত্রে ষ্টেশনের পথের ছোট ডুংরিটার সাদা সাদা কোয়ার্টজ্ পাথরের চাঁই গুলো, ছোট বট গাছটা অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। আজ সকালে গুইরাম গাড়োয়ানের সঙ্গে দেখা, সে বল্লে ঠিক্‌রী ও ধারাগিরির পথের জঙ্গলে খুব বন, বাঘের ভয়ও আছে। এবার আর যাওয়া হোল না, পূজার সময় যাবো।

এবার জীবনটা খুব গতিশীল হয়ে উঠেচে। এই তো গত শনিবারে রামনবমী, দোলের দিনও বারাকপুরে ছিলাম। দেখ্‌লাম আমাদের বাড়ীর পিছনে বাঁশ বনে কিরকম শুক্‌নো পাতার রাশ পড়েচে, নদীর ধারে চট্‌কা-তলা খালের উঁচু পাড়ে কিরকম ঘেঁটুফুল ফুটেচে, রঘুদাসীদের বাড়ীতে ওরা আবার এসেচে পথে রঘুদাসীর সঙ্গে দেখা। তার পরে খয়রামারির মাঠে

সেই বেদেদের তাঁবুর ছোট গর্ত্তটা, সেখানে সেদিনও আকন্দ ফুলের শোভা দেখ্‌তে গিয়েচি—রাজনগরের বটতলাটা সন্ধ্যাবেলায় একা বেড়িয়ে এসেচি আর ভেবেচি এসব জায়গা কত নিরাপদ, কত নিরীহ—হঠাৎ এক সপ্তাহের মধ্যে গালুডির বাংলোর পিছনে বসে লিখ্‌চি—রাণীঝর্ণা, নেক্‌ড়েডুংরি সব দেখা হয়েই গেছে। রাথামাইন্‌সে দু'রাত্রি যাপন করে এলাম।

কিন্তু একটা দেখ্‌লাম ব্যাপার। এসব স্থানে সঙ্গী নিয়ে আস্‌তে নেই। একা থাক্‌লে নিজের মন নিয়ে থাকা যায়। তখন নানা অদ্ভুত চিন্তা, অদ্ভুত ভাব এসে মনে জোটে। কিন্তু সঙ্গীরা থাক্‌লে তাদের মন আমাকে চালিত করে—আমার মন তখন আর সাড়া দেয় না, কেমন গভীর অতল তলে লাজুক তার মুখ লুকিয়ে থাকে। কাজেই সঙ্গীদের চিন্তা তখন হয় আমার চিন্তা—সঙ্গীদের ভাব তখন হয় আমার ভাব, আমার নিজস্ব জিনিস সেখানে কিছু থাকে না। কাল সুবর্ণরেখার পারের সূর্য্যাস্তের দৃশ্যটা, কিংবা গভীর রাত্রের জ্যোৎস্নায় মহুলিয়ার প্রান্তরের ও নেক্‌ড়েডুংরী পাহাড়ের সে অবাস্তব সৌন্দর্য্য, একা থাক্‌লে এসব দৃশ্যে আমার মন কত অদ্ভুত কথা বল্‌তো—কিন্তু কাল শুধু আড্ডা দেওয়াই এবং চা খাওয়াই হোল—মন চাপা পড়ে রইল বটে, অর্থহীন প্রলাপ বকুনির তলায়, সম্মিলিত সিগারেট্‌ ধূমের কুয়াসার আড়ালে।

তাই বল্‌চি এসব স্থানে আসতে হয় একা। লোক নিয়ে আসতে নেই।

আজই এখান থেকে যাবো। এখনি বলরাম সায়েরের ঘাটে নিয়ে আসবো—অনেকদিন পরে ওতে বড় আনন্দ পাবো। দূরে কালাঝোর পাহাড়, চারিধারে তালের সারি, স্বচ্ছ শীতল জল—দীঘিটা আমার এত ভাল লাগে!

শালবনে নতুন কচি পাতা গজিয়েচে। দূরে কোথায় কোকিল ডাক্‌চে কালাঝোর পাহাড়ের দিকে। এত ভাল লাগ্‌চে সকালটা!

খুড়োদের ছাদে বসে লিখ্‌চি। গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী এসেচি। এবার গালুডিতে অনেকদিন থেকে আমার যেন নতুন চোখ খুলেচে, গাছপালার বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্য এবার বেশী করে চোখে পড়চে। সমস্ত গ্রামটা যেন একটা পার্ক—আমার বাড়ীতে কোনো গাছ থাকুক আর নাই থাকুক, সারা গ্রাম এমন কি কুঠীর মাঠ, ইছামতীর দুই তীর, শ্যামল বাঁশবন—এসবই আমার। আমি দেখি, আমার ভাল লাগে—আমার না তো কার?

প্রায়ই বিকেলে কুঠীর মাঠে বেড়াতে যাই, এবার একটা নতুন পথ খুলেচে মাঠের মধ্যে দিয়ে, সেটা আরও অপূর্ব্ব। এমন সবুজ মাঠে, উলুফুল ফুটেচে চারি ধারে, শিমূলগাছ হাত বেঁকিয়ে আছে, দূর বনান্ত শীর্ষে বিরাটকায় Lyre পাখীর পুচ্ছের মত বাঁশবনের মাথা দুল্‌চে, এমন শ্যামলতা এমন শ্রী—এ আমাদের এই দেশটা ছাড়া আর কোথাও নেই। দুপুরে আজ বেজায় গরম, কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি বলে অত গরমেও খুব ঘুমুলাম।

উঠে দেখি মেঘ করেচে। উত্তর পশ্চিম কোণে ঘন নীল-কৃষ্ণ কাল-বৈশাখীর মেঘ,—তারপর উঠল বেজায় ঝড়। আমি আর ঘরে থাকৃতে পারলাম না, একখানা গামছা নিয়ে তখনি নদীর ঘাটে চলে গেলাম। পথে জেলি বল্লে শীগ্‌গির নেকোতলায় যান্‌, ভয়ানক আম পড়চে। কিন্তু আজ আর আম কুড়োবার দিকে আমার খেয়াল নেই। আমি নদীর ধারে কালবৈশাখীর লীলা দেখ্‌তে চাই। নদীজলে নাম্‌বার আগেই বৃষ্টি এল। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল—জলে নেমে দেখি জল গরম, যেন ফুট্‌চে। এপার ওপার সাঁতার দিতে লাগ্‌লাম, কালো জলে ঢেউ উঠেচে, মুখে নাকে মাথায় ঢেউ ভেঙে পড়চে, ওপারে চরের ওপর বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্চে বন্তেবুড়ো গাছ ঝড়ে উল্টে উল্টে যাচ্চে, বৃষ্টির ধোঁয়ায় চারিধারে অন্ধকার হয়ে গেল, নদীজলের অপূর্ব্ব সুঘ্রাণ বেরুচ্চে, দূর দূর সমুদ্রের কথা মনে হচ্চে। এমনি কত ঝটিকাময় অপরাহ্ণ ও নীরন্ধ্র অন্ধকারময়ী রাত্রির কথা—প্রকৃতির মধ্যে এমনি মিশে হাত ধরাধরি করে চলা—ঐ শ্যামল ডালপালা ওঠা শিমূলগাছ, সাঁইবাব্‌লা গাছ—এই তো আমি চাই। এদের সঙ্গে জীবন উপভোগ করবো—ঐ ঝোড়ো-মেঘে আমার ভগবানের উপাসনা, ঐ তীক্ষ্ণ নীল বিদ্যুতে, এই কালো নদীজলের ঢেউয়ে, ঝড়ের গন্ধে, বাতাসের গন্ধে, বৃষ্টি-ভেজা মাটীর গন্ধে, চরের ঘাসের কাঁচা গন্ধে—।

কাল কুঠীর মাঠে বসে এই সব কথা ভাবছিলাম। তারপর নদীজলে নাইতে নেমে কেমন একটা ভক্তির ভাব মনে এল। সমস্ত দেহ মন যেন আপনা আপনি নুইয়ে পড়তে চাইল। এ ধরণের ভক্তি একটা বড় bliss, জীবনে হঠাৎ আসে না। যখন আসে, তখন বিরাট রূপেই আসে, আনন্দের বন্যা নিয়ে আসে প্রাণের তীরে। এ Realisation যেমন দুর্ল্লভ, তেমনি অপূর্ব্ব।

আমি ভগবানকে উপলব্ধি করতে চাই। তাঁর এই লক্ষ বিরাট রূপের মধ্য দিয়ে।

এবার মোটে বৃষ্টি নেই—পথঘাট এখনও শুকনো খট্‌খটে, অন্যবার এমন সময় খানা ডোবা জলে ভরে যায়, কুঠীর মাঠের রাস্তায় কাদা হয়। তবে এবার সোঁদালি ফুল যেন কমে আস্‌চে, বেল ফুলের গন্ধেরও তেমন জোর নেই।

কাল বিকেলে পাঁচী এসেচে। সে, আমি, খুকু, রাণু, মায় ন'দি ক'জনে কাল বসে কালিদাসের মেঘদূত ও কুমার-সম্ভবের চর্চ্চা করেচি। বিকেলে আমি কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলাম। ঘাটে স্নান করতে এসে দেখি ওরা সবাই ঘাটে—খুকু ও রাণু সাঁতার দিয়ে গিয়েচে প্রায় বাঁধালের কাছে। আমি স্নান সেরে উঠে আস্‌চি, কালো তখন গেল শিমূল তলাটার কাছে। আমি বল্লুম, তোর মা ঘাটে তোকে ডাক্‌চে। সে 'যাই' বলে একটা বিকট চীৎকার ক'রে চলে গেল। একটু পরে দেখি খুকু আমায় ডাক্‌চে—বাঁশবন প্রায় আন্ধকার হয়ে এসেচে—ও ঘাট থেকে আসবার সময় বোধ হয় অন্ধকার দেখে ভয় পেয়েচে। আমি দাঁড়িয়ে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলুম।

আজ ওবেলা স্নানের সময় মনে কি যে এক অপূর্ব্ব ভাব এসেছিল! প্রতিদিনের জীবন এই মুক্তরূপা প্রকৃতির মধ্যে সার্থক হয় এখানে—এইসব ভাবে ও চিন্তার ঐশ্বর্য্যে।

আজ অনেক কাল পরে ন'দির কাছ থেকে গৌরীর হাতের লেখা একখানা গানের খাতা পেয়েচি। এতদিন কোথায় এখানা পড়ে ছিল, বা কি ক'রে ন'দির হাতে এল—তার কোনো খবর এরা দিতে পারলে না। Appropriately enough, খাতায় প্রথম গানটিই হচ্চে—

ঐ নীল উজ্জ্বল তারাটি
করুণ, অরুণ তরুণ কিরণ অমিয় মাখানো হাসিটি
বহুদূর জগতে গিয়েছে গো চলি প্রণয়বৃন্ত ছিঁড়িয়া
ভালবাসা সব ভুলে গেছে......

চৌদ্দ পনেরো বছর আগের এম্‌নিধারা কত উজ্জ্বল রৌদ্রালোকিত প্রভাত, বর্ষায় কত মেঘমেদুর সন্ধ্যার কথা মনে আনে।...

যাক্। কাল আকাশে হঠাৎ বৃশ্চিক-নক্ষত্র দেখেচি—একে প্রথম চিনি বেল পাহাড়ের ষ্টেশনে—পরিমল আমাকে চিনিয়ে দেয়—আমি ওটা চিনতাম না। কাল দেখি শ্যামাচরণ দাদাদের বাঁশঝাড়ের মাথার ওপর বিরাট ওর

অগ্নিপুচ্ছটা বেঁকে আছে। আকাশের ওদিকটা আলো হয়ে উঠেচে···খুকুকে বল্লুম,—ঐ ছাখ্ বৃশ্চিক নক্ষত্র—

তাকে চিনিয়ে দিলুম। রাণু জিগ্যেস্ করলে—তবে তার বয়েস যদিও খুকুর চেয়ে অনেক বেশি, সে অত বুদ্ধিমতী নয়—পনেরো মিনিট কঠিন পরিশ্রমের পরে তাকে বোঝাতে পারলুম কোনটাকে আমি বৃশ্চিক রাশি বলতে চাচ্ছি।

এদিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল ঢলে পড়চে ক্রমেই মেজো খুড়ীমাদের রান্নাঘরের ওপরে। রাত অনেক হোল, ওরা তবুও তাস খেলবেই। বেগতিক দেখে বল্লুম, আলোতে তেল নেই।

নইলে ঘুম হবার যো নেই, ওদের খেলার গোলমালে।

লণ্ঠন নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম, রাত তখন বারোটার কম নয়।

বিকেলে কালো আর আমি মোল্লাহাটির পথে বেড়াতে গেলাম। আজ দুপুরে যখন এপাড়ার ঘাট থেকে ওপাড়ার ঘাটে সাঁতার দিয়ে যাই, তখনই খুব মেঘ করেছিল—একটু পরে সেই যে বৃষ্টি এল, আর রোদ ওঠেনি। মেঘ ভরা বিকেলে শ্যামল মাঠ ও দূরের বাঁশ বন, বড় বড় বটগাছ, এক রকম কি গাছ আছে, মখমলের মত নরম সবুজ পাতা ডালপালা ছড়িয়ে দিয়ে ঝোপের সৃষ্টি করে—এসবের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে মোল্লাহাটি ও পাঁচপোতা বামুনডাঙ্গার পথের মোড়ে গিয়ে একখানা ছই-চাপা গরুর গাড়ীর সঙ্গে দেখা হোল। তাদের গাড়োয়ান জিগ্যেস্ করলে, বাবুর কাছে কি বিড়ি আছে?

—না, নেই। বিড়ি খাইনে—

—আপনারা কোথায় যাবেন?

—কোথাও যাবো না, এই পথে একটু বেড়াচ্চি।

ফিরবার পথে মনে হোল কল্‌কাতায় থাকবার সময় যখন গাছপালার জন্যে মনটা হাঁপায়, তখন যে কোনো একটু ছবি, একটা বনের ফটোগ্রাফ দেখে মনে হয়, ওঃ কি বনই এদেশে! প্রায়ই বিদেশের ফটো—আফ্রিকার, কি দক্ষিণ আমেরিকার—কিন্তু তখন ভুলে যাই যে আমাদের গ্রামের চারিপাশে সত্যিকার বন জঙ্গল আছে অতি অপূর্ব্ব ধরণের—যখন বিলিতি Grand Evening Annual দেখি তখন ভুলে যাই কত ধরণের অদ্ভুত গাছ আছে আমাদের বনে জঙ্গলে—যা বাগানে, পার্কে নিয়ে রোপণ করলে অতি

সুদৃশ্য কুঞ্জবন সৃষ্টি করে—যেমন ষাঁড়া, কুঁচলতা, ঐ নাম-না-জানা গাছটা—এরা যে কোন বিখ্যাত পার্কের সৌন্দর্য্য ও গৌরব বৃদ্ধি করতে পারে।

সেদিন যখন আমি, রাণু, খুড়ীমা, ন'দি নদীতে বিকেলে স্নান করচি তখন একটা অদ্ভুত ধরণের সিঁদুরে মেঘ করলে—ওপারের খড়ের মাঠের উলুবনের মাথা, শিমূলগাছের ডগা, যেন অবাস্তব, অদ্ভুত দেখাল, যেন মনে হচ্ছিল ওখান থেকেই নীল আকাশটার শুরু।

কিন্তু কাল সন্ধ্যায় একা নদীতে নেমে যে অপূর্ব্ব অনুভূতি হয়েছিল তা বোধ হয় জীবনে আর কোনোদিন হয়নি। তার মাথায় একটা তারা উঠেচে—দূরে কোথায় একটা ডাহুক পাখী অবিশ্রান্ত ডাকচে। মাধবপুরের চরের দিকে ভায়োলেট্ রঙের মেঘ করেচে—শান্ত, স্তব্ধ নদীজলে তার অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব।

মানুষ চায় এই প্রকৃতির পটভূমির সন্ধান। এতদিন যেন আমার Emerson-এর মতের সঙ্গে খুব মিল ছিল—সেদিনও বঙ্গশ্রী আফিসে কত তর্ক করেচি, আজ একটু মনে সন্দেহ জেগেচে। মানুষ এই সৃষ্টিকে মধুরতর করেচে। ওই দূর আকাশের নক্ষত্রটি—ওর মধ্যেও স্নেহ, প্রেম, যদি না থাকে, তবে ওর সার্থকতা কিছুই নয়। হৃদয়ের ধর্ম্ম সব ধর্ম্মের চেয়ে বড়।

আজ সকাল থেকে বর্ষা নেমেচে। ঝিম্-ঝিম্ বাদ্‌লা, আকাশ অন্ধকার। আজ এই মেঘমেদুর সকালে একবার নদীর ধারে বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছে করচে—বাঁওড়ের ধারের বেলে মাটীর পথ বেয়ে একেবারে কুঁদীপুরের বাঁওড় বাঁয়ে রেখে মোল্লাহাটীর খেয়া পার হয়ে, যেতে ইচ্ছে হচ্চে পিসিমার বাড়ী পাট্‌শিমলে বাগান-গাঁ। কাল সুন্দরপুর পর্য্যন্ত বেড়াতে গিয়েছিলুম বৈকালে—ও পথের প্রাচীন বটগাছের সারির দৃশ্য আমি আবাল্য দেখে আস্‌চি, কিন্তু ও পুরোনো হোল না—যত দেখি ততই নতুন। গাছে গাছে খেজুর পেকেচে, কেঁয়োঝাঁকা গাছের তলায় ব্যাঙের ছাতা গজিয়েচে এই বর্ষায়। আরামডাঙার মাঠে মরগাঙের ওপারে, সবুজ আউশ ধানের ক্ষেত এবং গ্রামসীমায় বাঁশবনের সারি মেঘমেদুর আকাশের পটভূমিতে দেখতে হয়েচে যেন কোন বড় শিল্পীর হাতে আঁকা ল্যাণ্ডস্কেপ্। ক্ষেত্রকলু ওদিক থেকে ফিরচে, হাতে ভাঙা লণ্ঠন একটা। বল্লে মোল্লাহাটির হাটে পটল কিন্‌তে গিয়েছিল।

—পটল না কিনেই ফিরলে যে?

—কি করবো বাবু, ছ'পয়সা সের দর। একটা পয়সাও লাভ থাকচে না।

গোপালনগরের হাটেও ওই দর। এবার তাতে আবার পটল জন্মায় নি। যে দুঃখচ্ছর পড়েচে বাবু!

কল্‌কাতাটা যেন ভুলে গিয়েচি। যেন চিরকাল এই বটের সারি, বাঁওড়, সুন্দরপুর, সখীচরণের মুদীখানার দোকানে কাটাচ্চি জীবনটা। এদের শান্ত সঙ্গ আমার জীবনে আনন্দ এনেচে উগ্র দুরাশার মত্ততা ঘুচিয়ে। সে দুরাশাটা কি? নাই বা লিখলাম সেটা।

আজ বিকেলে সারা ঈশান কোণ জুড়ে কালবৈশাখীর মেঘ করল এবং ভয়ানক ঝড় উঠ্‌ল। হাজরী জেলেনী, জগবন্ধু, কালো, জেলি ওরা আম কুড়ুতে গেল বাগানে—কারণ এখনও আম যথেষ্ট আছে, ঝিনুকে গাছে, চারা বাগানে, মাঠের চারায়।

তারপর ঘন বর্ষা নামলো—আমি আর কালো বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম বর্ষাস্নাত গাছপালা, বটের সারি, উলুর মাঠের মধ্য দিয়ে বেলেডাঙাতে। সেখান থেকে যখন ফিরি, বর্ষা আরও বেশি, বিদ্যুতের এক একটা শিখা দিক্ থেকে দিগন্তব্যাপী—আকাশ কালো কালো মেঘ উড়ে চলেচে—আমার মনে হোল আমিও যেন ওদের সঙ্গে চলেচি মহাব্যোম পার হয়ে চিন্তাতীত কোন্ সুদূর বিশ্বে—আকাশ মহাকাশে আমার সে গতি —পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন, সুখদুঃখ ঘরগৃহস্থালীর বন্ধনমুক্ত আমার আত্মা, সে পায়ের তলায় সারা পৃথিবীর মোহ মাড়িয়ে চলেচে—মহাব্যোমের অন্ধকার, শূন্য, মেঘ, ইথার, সমুদ্র ভেদ করে মুক্তপক্ষ গতিতে [illegible] চলেচে— দিক্‌পাল বৈশ্রবণের বিশ্ববিদ্রাবণকারী পৌরুষের বীর্য্যে।

নদীতে স্নান করতে নেমে সাঁতার দিয়ে বৃষ্টি মাথায় চলে গেলুম ওপারে মাধবপুরের চরের ওপর বর্ষা দেখতে—পশ্চিম দিকে পিঙ্গল বর্ণের মেঘ হয়েচে, ওপারের বাঁশবন হাওয়ায় দুলচে—তারপর আমরা আবার এপারে এলাম—ঠিক সন্ধ্যার সময় বাড়ী এলাম।

আজকার সন্ধ্যাটী ঠিক বর্ষাসন্ধ্যা—কিন্তু কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হচ্চে। যেন আর কেউ থাক্‌লে ভাল হোত—কত থাক্‌লেই তো ভাল হোত—সব সময় হয় কৈ?

আমার মনে এই যে অনুভূতি—এ অনেক কাল পরে আবার হোল। আমি কত নিঃসঙ্গ নির্জ্জন জীবন যাপন করেচি কতকাল ধরে, লোকালয়

থেকে কতদূরে। কিন্তু ১৯২৩—২৬ সালের পরে ঠিক এ ধরণের বেদনা মাখানো নিঃসঙ্গতার অনুভূতি আর কখনো হয়নি। এই মনের অবস্থা আমি জানি, চিনি একে—এ আমার পুরাতন ও পরিচিত মনোভাব, কিন্তু ১৯২৬—সালের পরে ভুলে গিয়েছিলাম একে—আবার সেই ফিরে এল।

কাল আবার খুব আনন্দ পেয়েচি। মনের ও ভাবটা কাল আর ছিল না। বিকেলে আমরা কাঁচিকাটার স্কুলের পথে অনেকদূর পর্য্যন্ত বেড়াতে গেলাম। নীল মেঘে সারা আকাশ জুড়ে ছিল—কাল স্নান করে ফিরবার পথে শিমুল গাছটার ওদিকে আউশ ধানের ক্ষেতের ওপরকার নীল আকাশ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম—অমনি মনের ভাব বিকেলেও হয়েছিল। আরামডাঙার ওপারে সেই খাব্‌রাপোতার দিকের আকাশে একটা নীল পিঙ্গল বর্ণ-শ্রী, সূর্য্য বোধহয় অস্ত যাচ্ছিল, আমরা কিন্তু পেয়ারা গাছটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না—আমি আর কালো কত খুঁজলাম, আরামডাঙ্গার পথে মরগাঙের ধারে সেই পেয়ারা গাছটা যে কোথায় গেল!

সন্ধ্যার কিছু আগে কুঠীর মাঠে একটা ঝোপেঘেরা নতুন জায়গা আবিষ্কার করা গেল—এদিকটায় কখনো আসিনি—এমন নিভৃত স্থানটা, খুব আনন্দে নদীতে সাঁতার দিলাম।

এবার বারকপুরে চমৎকার ছুটীটা কাট্‌ল। সমস্ত ছুটীটাই তো এখানে রয়েচি। আর বছর এখানে ১০।১১ দিন মাত্র ছিলাম—বনগাঁয়ে ছিলাম বেশীদিন। এবার এখান থেকে কোথাও যাইনি। এখান থেকে যেতে মনও নেই। কল্‌কাতার জীবনটা যেন ভুলে যেতে বসেচি।

কাল বিকেলে ঘন কালো মেঘ করে বৃষ্টি এল। আমি আর কালো বৃষ্টিমাথায় বেলেডাঙার পুল পর্য্যন্ত বেড়াতে গেলাম। ঝোপঝাপ ভিজে কেমন হয়ে গিয়েচে—গাছপালার গুঁড়ির রং কালো—ডালপাতা থেকে জল ঝরে পড়ার শব্দ। তারপরে নদীর জলে স্নান করতে নাম্‌লাম—সাঁতার দিয়ে বাঁধাল পর্য্যন্ত গেলাম। সাঁতার দিয়ে এত আনন্দ পাইনি কোনোদিন এবারকার গরমের ছুটীর আগে। কুঠীর মাঠের একটা নিভৃত স্থানে চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম—মাথার ওপর কালো মেঘ উড়ে যাচ্চে—দিক্ থেকে দিগন্তব্যাপী বিদ্যুতের শিখা—শুধু চারিদিকে বৃষ্টির শব্দ,—গাছে পাতায়, ডালপালায়, ঝোড়ো হাওয়া বইচে—নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে

একা দাঁড়িয়ে থাকার সে অনুভূতির তুলনা হয় না। তার প্রকাশের ভাষাও নেই—যা খুব ঘনিষ্ঠ, খুব আপন, তাকে কি আর প্রকাশ করা যায়?

আজ বিকেলে বহুদিন পরে ভারী সুন্দর রাঙা রোদ উঠল। বাঁধালের কাছে নাইতে নেমে মাঝ জলে গিয়ে ওপারের একটা সাঁইবাব্‌লা গাছের ওপর রোদের খেলা দেখ্‌ছিলাম—কি অদ্ভুত ধরণের ইন্দ্রনীল রং-এর আকাশ, আর কি অপূর্ব্ব সোনার রং রোদের।...সকলের চেয়ে সেই সাঁই-বাব্‌লা গাছের বাঁকা ডালপালা ও ক্ষুদে ক্ষুদে সবুজ পাতার ওপর সোনার রংয়ের রোদের খেলা।...তারই পাশে ওপারের কদম্বগাছটাতে বড় বড় কুঁড়ি দেখা দিয়েচে...শ্রাবণের প্রথমেই ফুল্লপুষ্পসম্ভারে নতশাখ-নীপতরুটী বর্ষাদিনের প্রতীক্ স্বরূপ ওই সবুজ উলুখড়ের মাঠে স্বমহিমায় বিরাজ করবে—বর্ষার ঢল নেমে ইছামতী বেড়ে ওর মূল পর্য্যন্ত উঠ্‌বে, ঝরা কেশররাজি ঘোলাজলের খরস্রোতে ভেসে চলে যাবে...উলুবন আরও বাড়্‌বে...আমি তখন থাক্‌বো কল্‌কাতায়, সে দৃশ্য দেখ্‌তে আস্‌বো না।

কাল সকালে এখান থেকে যাবো, আজই এখানে থাকার শেষ দিন এ বছরের মত। এবার ছুটীটা কাট্‌ল বেশ—কি প্রকৃতির দিক থেকে, কি মানুষের দিক থেকে, অদ্ভুত ভাবে ছুটীটা উপভোগ করা গেল এবার। কল্‌কাতায় থাক্‌লে আমার যে আফ্রিকা দেখ্‌বার ইচ্ছে হয়, পাহাড় জঙ্গল দেখ্‌বার ইচ্ছে হয়—এখানে দীর্ঘদিন কাটালে কিন্তু আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। গাছপালায়, নীল আকাশে, নদীর কালোজলে সাঁতার দিতে দিতে দু'পাশের বাঁশবন, সাঁইবাব্‌লার সারি চেয়ে চেয়ে দেখা, সবুজ উলুর মাঠের দৃশ্য, পাখীর অবিশ্রান্ত ডাক—এখানে মনের সব ক্ষুধা মিটিয়ে দেয়। বসে লিখ্‌চি, রাণু এসে বল্লে—দাদা এক কাপ চা খাবেন কি? সে ওদের রান্নাঘর থেকে চা নিয়ে এসেচে বয়ে। আর কাল থেকে অনবরত বল্‌চে—দাদা চলে যাবেন না কাল, আর একদিন থাকুন, আপনি চলে গেলে পাড়া আঁধার হয়ে যাবে।

কাল সমস্ত দিনের মধ্যে অন্ততঃ তিন-চার বার একথা বলেচে—অথচ ওর ওপর কি অবিচার করেচি এবার—ওকে নিয়ে তাস খেলিনি একটী দিনও—ও খেল্‌তে চাইলেও খেলিনি। ভাল করে কথাও বলিনি।

বল্লে—জন্মাষ্টমীর ছুটীতে আস্‌বেন তো?

আমি বল্লাম—যদিই বা আসি, তোমার সঙ্গে আর তো দেখা হবে না তুই তার আগেই ত চলে যাবি।

এদের কথা ভেবে কল্‌কাতায় প্রথম প্রথম কষ্ট হবে।

পূজার ছুটীতে বাড়ী এসেচি। রাখামাইন্‌স্ গিয়েছিলাম। সেখানে একদিন একা মেঘান্ধকার বিকালবেলাতে সাটকিটার অরণ্যময় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বেড়িয়ে এসেছিলাম। এই পথে একা যেতে ওদেশের লোকেও বড় একটা সাহস করে না—যখন একটা ছোট পাহাড়ী ঝর্ণায় নেমে রবীন্দ্রনাথের চিঠির একটা অংশ সেখানে রেখে দিচ্ছি, কাল নীরদবাবুদের বিশ্বাস করাবার জন্যে, তখন সেখানে কুলুকুলু ঝরণার শব্দটী মেঘশীতল বৈকালের ছায়ায় কি সুন্দর লাগ্‌ছিল! পাহাড়ের saddle-টা যখন পার হচ্ছি তখন ঝম-ঝম করে বৃষ্টি নামল, হাজার হাজার বনস্পতির পাতা থেকে পাতায় ঝর-ঝর করে বৃষ্টি পড়ছিল। দূরের কালাঝোর পাহাড় মেঘের ছায়ায় নীল হয়ে উঠেচে—ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে খেলা করচে। কালিদাসের 'সানুথান আম্রকুট' কথাটী বার বার মনে পড়ছিল—একা সেই মহুয়াতলায় শিলাখণ্ডে বসে।

একদিন রাখামাইন্‌স্-এর বাংলোর পিছনে বনতুলসীর জঙ্গলে ভরা পাহাড়টার মাথায় অস্তগামী সূর্য্যের আলোতে বসেছিলাম; ওদিকে রাঙা রোদ মাখানো সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মাথাটা দেখা যাচ্ছে, এদিকে পাহাড়ের Lodge থেকে দূরে গালুডির চারুবাবুর বাংলো দেখা যাচ্চে—সেদিন কি আনন্দ যে মনে এল—তার বর্ণনা ভাষায় দেওয়া যায় না। সেদিন আবার বিজয়া দশমী—নীল ঝরণার ধারে একটা শিলাখণ্ডে একা বসে রইলাম সন্ধ্যাবেলাতে, ক্রমে জ্যোৎস্না উঠল, মহুয়াতলার ঘাট দিয়ে পাহাড়ের দিক দিয়ে ঘুরে আসতে আসতে কুসুমবনীতে উড়িয়া মুদীর দোকানে গেলাম সিগারেট্ কিনতে। আশ্চর্য্যের বিষয় এইখানে হঠাৎ নীরদবাবুর সঙ্গে দেখা হোল। তিনি ও তাঁর স্ত্রী Shanger সাহেবের বাংলো থেকে চা খেয়ে ঐ পথে মেঘ-ঢাকা অস্পষ্ট জ্যোৎস্নাতে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন—বিজয়ার কোলাকুলি সেই দোকানেই সম্পন্ন হোল। ভাবলাম, আজ আমাদের দেশে বাঁওড়ের ধারে বিজয়া দশমীর মেলা বসেচে।

তার পরদিন আমরা গালুডিতে গেলাম ডোঙাতে সুবর্ণরেখা পার হয়ে—চারুবাবুদের বাংলোতে গিয়ে সুরেনবাবু, আমি নেক্‌ড়েডুংরি পাহাড়ে গিয়ে উঠে বসলাম। চা খেয়ে আশাদের বাড়ী গিয়ে গান শুনলাম আশার—সেখানে বিজয়ার মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়লে না। ফিরবার পথে সুবর্ণরেখাতে ডোঙা পাওয়া গেল না—অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নারাত্রে সুবর্ণরেখা রেলের পুল দিয়ে চন্দ্ররেখা গ্রামের মধ্যে দিয়ে অনেক রাত্রে ফিরলাম রাখামাইন্‌সের বাংলোতে। নদী পার হবার সময়ে সেই ছবিটা—সেই নদীর ওপরে জ্যোৎস্নাভরা আকাশে একটীমাত্র নক্ষত্র দেখা যাচ্চে, নীচে শিলাস্তৃত সুবর্ণরেখা, পশ্চিম তীরে ঘন শাল জঙ্গল, দূরে শ্যামপুর থানার ক্ষীণ আলো, লাইনের বামদিকের গাছগুলো আধ জ্যোৎস্নায় আধ অন্ধকারে দেখা যাচ্চে না, কিন্তু ফুটন্ত ছাতিম ফুলের ঘন সুগন্ধ; বাংলোতে ফিরে এসে দেখি—প্রমোদবাবু এসে বসে আছেন।

পরদিন আমরা সবাই মিলে সাটকিটার জঙ্গলের পথে গেলাম—তারপর দিন গালুডি থেকে চারুবাবু, সুরেনবাবু ও মেয়েরা এলেন। চারনম্বর খাদানের নীচের জঙ্গলের মধ্যে পিক্‌নিক্ হোল। ঝুনু, আশা, আমি, চারুবাবু, সুরেনবাবু ও ভিক্টোরিয়া দত্ত বলে একটী মেয়ে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি আরোহণ করলাম। একেবারে সিদ্ধেশ্বরের মাথায়। একটা অম্লমধুর বনফলের কাঁচা ডাল ভেঙে নিয়ে পাহাড়ে উঠলাম—তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে।

সেদিন আমি ষ্টেশনের বাহিরে কি একটা গাছের ছায়ায় পাথরের ওপর বসে রইলাম যেমন সেদিন সকালে আমি ও প্রমোদবাবু পিয়ালতলার ছায়ায় প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডে শুয়ে বটগাছটার দিকে চেয়ে প্রভাতী আলোতে অজানা কত কি পাখীর গান শুন্‌ছিলাম।······

বেলা পড়ে এসেচে···বারাকপুরে বসে এইসব কথা লিখতে লিখতে মন আবার ছুটে চলে যাচ্চে সেই সব দেশে। শীতের বেলা এত তাড়াতাড়ি রোদ রাঙা হয়ে গাছের মাথায় উঠে গেল! বকুলগাছের মাথায়, বাঁশগাছের মাথায় উঠে গিয়েচে রোদ একেবারে।

সেই সুন্দর লতাপাতার গন্ধটা এবার ভরপুর পাচ্চি—ঠিক এই সময়ে ওটা পাওয়া যায়। কাল এখানে চড়কতলায় কৃষ্ণযাত্রা হোল, জ্যোৎস্নারাত্রে গাছপালায় শিশির টুপটাপ ঝরে পড়চে—আমি চালতেতলার পথে একা শুধু বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলাম। কি রূপ দেখলাম কাল জ্যোৎস্নাভরা রহস্যময়ী হেমন্ত রাত্রির! কাল নদীর ধারে বিকেলেও অনেকক্ষণ বসেছিলাম।

কাল বিকেলে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে পাটলবর্ণের মেঘস্তূপের দিকে চোখ রেখে একটা জলার ধারে বসলাম—গাছপালার কি রূপ! সেই যে গন্ধটা এই সময় ছাড়া অন্য সময় পাওয়া যায় না—সেই গন্ধ দিন রাত সকাল সন্ধ্যা আমাকে যেন অভিভূত করে রেখেচে।

আজ ক'দিন বর্ষা পড়েচে—বসে বসে আর কোনো কাজ নেই, খুকুদের সঙ্গে গল্প করচি, কাল সারাদিনই এইভাবে কেটেচে, তবুও কাল নদীতে এপাড়ার ঘাট থেকে ওপাড়ার ঘাটে সাঁতার দিলাম, একটু ব্যায়ামের জন্যে। আজ সকালে নদীর ঘাটে ভোরবেলা গিয়ে মেঘমেদুর আকাশের শোভায় আনন্দ পেলাম। এই শিমূলগাছগুলো আমাদের এদেশের নদীচরের প্রধান সম্পদ! এগুলো আর সাঁই বাব্‌লা না থাকলে ইছামতীর তটশোভা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হোত।

আজ সকালে নদীর ঘাটে গিয়ে চারিদিকের আকাশে চেয়ে চেয়ে দেখলাম মেঘ অনেকটা কেটেছে—আকাশের নীচে একটু একটু আলো দেখা যাচ্চে—বোধহয় ওবেলা আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। মনটা তপ্ত নির্ম্মল আকাশ ও প্রচুর সূর্য্যালোকের জন্যে হাঁপাচ্চে—কাকাদের শিউলি গাছটার দিকে চেয়ে দেখচি গাছপালার স্বাভাবিক প্রভাতী রং ফিরে এসেচে—সে ঘসা কাচের মত রং নেই আকাশের।…কিন্তু একটু পরেই ঘন মেঘে সব ঢেকে দিলে।

আমি আবিষ্কার করেচি আমাদের দেশের প্রথম হেমন্তের সেই অপূর্ব্ব সুগন্ধটা প্রস্ফূটিত মবুচে-লতার ফুলের গন্ধ। হঠাৎ কাল বিকেলে আমি এটা আবিষ্কার করেচি। কুঠীর মাঠে আজ স্নানের পূর্ব্বে বেড়াতে গিয়ে বনে বনে খানিকটা বেড়ালাম, লক্ষ্য করে দেখলাম এই সময়ে কত কি বনের লতা-পাতায় ফুল ফোটে। মবুচে-লতা তো পুষ্পিত হয়েছেই, তা ছাড়া মাখম-সিমের গোলাপী ফুলের দল ঘনসবুজ পাতার আড়ালে দেখা যাচ্চে, কেয়োঁঝাঁকার লতায় ক্ষুদে ক্ষুদে ফুল ফুটেছে, ফুল বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন হলদে পুষ্পরেণু,—কি ভুরভুরে মিষ্টি গন্ধ, ডালের গায়ে পর্য্যন্ত ফুল ফুটেছে। ছাতিম ফুলের এই সময়, কুঠীর মাঠের জঙ্গলে একটা নবীন সপ্তপর্ণ তরুর দেখা মিলল, কিন্তু ফুল হয়নি তাতে। মেটে আলু তুলবার বড় বড় গর্ত্ত বনের মধ্যে, এক জায়গায় একটা বড় কেয়োঁঝাঁকার ঝোপকে কেটে ফেলেচে দেখে

আমার রাগ ও দুঃখ দুইই হোল, নিশ্চয় যারা মেটে আলু তুলতে এসেছিল; তাদেরই এই কাজ। সজীব পুষ্পিত গাছ—কারণ এই সময় কেরোঝাঁকার ফুল হয়—কেটে ফেলা যে কতদূর হৃদয়হীন বর্ব্বরতা, তা আমাদের দেশের লোকের বুঝতে অনেকদিন যাবে। সেবার অমনি যুগল কাকাদের বাড়ীর সামনের কদমগাছটা কালো বিক্রী করে ফেললে তিন টাকায়, জ্বালানি কাঠের জন্যে। এমন কি কেউ কোথাও শুনেচে? কদমগাছ, যা গ্রামের একটা সম্পদ, যে পুষ্পিত নীপ সকল বৈষ্ণব কবিকুলের আশ্রয় ও উপজীব্য—সামান্য তিনটে টাকার জন্যে সে গাছ কেউ বেচে? শুধু আমাদের দেশের এ ধরণের ঘটনা সম্ভব হয়, সুন্দরকে দেখবার চোখ থাকলে, ভালবাসবার প্রাণ থাকলে এ সব কি আর হোত?

কাল বিকেলে অল্পক্ষণের জন্য সোনালী রাঙা রোদ উঠল—বেলেডাঙার পথে যেখানে একটা বাব্‌লা গাছের মাথায় একটা বুনো চালকুমড়ো হয়ে আছে, ঐখানটাতে বসলুম—কতদিনের মেঘমেদুর আকাশের পরে আজ রোদ উঠেচে, এ যেন পরম প্রার্থিত ধন!

এক জায়গায় সোঁদালি ফুল ফুটে থাকৃতে দেখলাম মাঠের মধ্যে। কার্ত্তিক মাসের সোঁদালি ফুল, কল্পনা করতেই পারা যায় না। কেলেকোঁড়ার ফুলও এসময়ে হয়।

কাল মেয়েরা চোদ্দ শাক তুললে, চোদ্দ পিদিম দিলে—খুকুদের বোধন-তলায় বড় একটা প্রদীপ দিয়েছিল, বিলবিলের ধারে, উঠোনের শিউলি তলায়। বারাকপুরে চোদ্দ পিদিম দেওয়া দেখিনি কতকাল!

আজ বিকেলে খুকুদের কুঠীর মাঠে বেড়াতে নিয়ে গেলাম। পুরোনো কুঠীর হাউজ্‌ঘরে ঘোর জঙ্গল হয়ে গিয়েচে—কত কি বনের লতা হয়ে আছে—খুকুর তা দেখে আনন্দ উৎসাহ দেখে কে! একটা লতার মধ্যে কি ভাবে ঢুকে সে খানিকটা দুললে, মাঠে গিয়ে ছুটোছুটি করলে—আমায় কেবল চেঁচিয়ে বলে—দাদা, এটা দেখুন, ওটা দেখুন। তারপর ফিরে এসে ছেলেদের নিয়ে গোপালনগরে গেলাম কালী পূজোর ঠাকুর দেখাতে। হাজারীর ওখানে অনেক রাত হয়ে গেল তাস খেলতে বসে—অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরি।

পরদিনও আবার কুঠীর মাঠে যাওয়ার কথা ছিল—ওরা সবাই গেল, কিন্তু মনোরমার ভাই কালো কুঠীর জঙ্গলে হাঁটুটা বেজায় কেটে ফেললে;

তার ফলে সকলেরই বেড়ানো বন্ধ হোল। রাত্রে খুকুকে অনেক গল্প শোনালাম অনেক রাত পর্য্যন্ত।

আজ সকালে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। রায়বাড়ীর পাঁচী কাঁদচে, ওর দাদা আশু মাসখানেক হোল মারা গিয়েচে, সেই জন্যে। পাড়াগাঁয়ের মেয়ের ধরণে 'ও ভাই রে, বাড়ী এসো,' বলে চেঁচিয়ে কাঁদচে। কিন্তু আমার মনে সত্যিই দুঃখ হোল ওর জন্যে। পাঁচীকে এ গাঁয়ের সব লোকেই 'দূর ছাই' করে, সবাই ঘেন্না করে—আজ পাঁচী ওদের সবারই বড় হয়ে গিয়েচে। তবুও তার প্রতি সহানুভূতি নেই কারুর—কান্না শুনে পিসিমা বলচেন, মুখ বেঁকিয়ে —'আহা! মনে পড়েচে বুঝি ভাইকে!"

নৌকা করে বনগাঁয়ে যাচ্ছি সকালবেলা। চাল্‌কীর ঘাটে এসেচি—এবার এদিকের গড় ভেঙেচে। কেমন নীল রং-এর একটা পাখী বাব্‌লা গাছে বসে শিস্ দিচ্চে। নৌকোর দুলুনিতে লেখার বড় ব্যাঘাত হচ্চে। নীল কলমীর ফুল, হল্‌দে বড় বড় বন ধুঁধুলের ফুল ফুটেচে। আর এক রকম কি লতায় কুচো কুচো হল্‌দে ফুল ফুটে চাল্‌তেপোতার বাঁকে ঝোপের মাঝে আলো করে রেখেচে—সে যে কি অপূর্ব্ব সুন্দর তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এই ফুলের নাম জানি নে, যেন হল্‌দে নক্ষত্র ফুটে আছে—ছোট ছোট ক্ষুদে ক্ষুদে, যেন নববধূর নাকছাবি। কার্ত্তিকের শেষে এই ফুলটা ফোটে জেনে রাখলাম, আবার আস্‌চে বছর দেখ্‌তে আসবো। এতদিন এ ফুল আমার চোখে পড়ে নি। হেমন্তে এত বনের ফুলও ফোটে এদেশে! ঝোপের মাথা আলো করে সবুজ পাতালতার মধ্যে তিৎছন্নার ফুল, ক্ষুদে ক্ষুদে ঐ অজানা ফুল, মাঝে মাঝে বড় বড় বনকলমীর ফুল—কি রূপ ফুটেচে প্রভাতের। কাশফুল তো আছেই মাঝে মাঝে, নদী তীরের কি অপূর্ব্ব শোভা এখন—তা ছাড়া পুষ্পিত সপ্তপর্ণও মাঝে মাঝে যথেষ্ট।

ঐ অজানা ফুলটা মাঝিকে দিয়ে ঝোপ থেকে পাড়িয়ে আনলাম—দশটী করে ছোট ছোট পাপ্‌ড়ি—ছ'টা করে পরাগ কোষ বা গর্ভকেশর প্রত্যেকটাতে। জলে কচুরীপানার ফুল ফুটেচে, অনেকটা কাঞ্চন ফুলের রং কিন্তু দেখতে বড় চমৎকার—একটা লম্বা সরস সবুজ ডাঁটায় থোকা থোকা অনেকগুলো ফুল—ঐ সুন্দর ফুলের জন্যেই কচুরীপানা সৃষ্টির মধ্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে—ভগবানের কাছে সুন্দরের সার্থকতা অমর—তার

utility-টা গৌণ। মাঝি গল্প করছিল, এবার অনেকে ইছামতীতে মুক্তা পেয়েছে ঝিনুক তুলে। এসময়ে বন্যে বুড়ো গাছেও শাল মঞ্জরীর মত দেখতে সবুজ রং-এর ফুল ফুটেচে—আর একপ্রকার জলজ ঘাসের নীল ফুল ফুটেচে—এর রং ঠিক তিসির ফুলের মত নীল। এক একটা ছোট গাছের মাথায় ছোট ঝোপে—ঐ ক্ষুদে ক্ষুদে অজানা ফুল ফুটে আলো করচে।

কাল রাত্রে কি একটা কথা মনে এল—তরে শব্দ পরম্পরায় মনে একটা অপূর্ব্ব অননুভূত ভাবের উদয় হোল। শব্দেরও ক্ষমতা আছে। প্রমথবাবু বল্লেন, নেই, এই নিয়ে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে একদিন তর্ক করেছিলাম।

আজ সকালে উঠে দেখি আকাশ একেবারে নির্ম্মেঘ, নির্ম্মল। দুঃখ হোল এই ভেবে যে আমিও বারাকপুর থেকে এলাম আকাশও গেল পরিষ্কার হয়ে! আজ এই জন্যে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল—বারাকপুরে এমন নীল আকাশটা দেখতে পেলাম না! খুকুর গাওয়া সেই সেদিনকার গানটা বার বার মনে আসতে লাগল—

মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর
নমোনমঃ, নমোনমঃ, নমোনমঃ

কাল কলকাতা থেকে এসেচি। বেশ ভাল লাগল আজ সকালে খয়রামারির মাঠ ও বন। বনে সাদা সাদা সেই কুচো ফুল—শীতকালে অজস্র ফোটে এদেশের বনে জঙ্গলে—নদীয়া ও যশোর জেলার সর্ব্বত্র দেখেচি এসময়ে। কলেজে পড়বার সময় যখন প্রথম প্রথম মামার বাড়ী যেতাম—তখন ভবানীপুরের মাঠের ও দিকের পথ দিয়ে যাবার সময়ে দেখতাম একটা বড় ঝোপে ঐ ফুলটা ফুটে থাকত। কোলা এসেছিল আমার সঙ্গে আমার বাসায়—এক সঙ্গে বাক্স, বিছানা বেঁধে বাসা থেকে রওনা হলাম। অনেকদিন পরে ওকে দেখে মনে বড় আনন্দ পেয়েছি কাল।

বড়দিনের ছুটীতে অনেককাল বারাকপুরে আসিনি—এবার এলাম। শীতের পল্লীপ্রান্তের কি শোভা, তা এতদিন ভুলে ছিলাম। বিকেলে আজ যখন বেলেডাঙ্গা বেড়াতে গেলাম—বনের কোলে সর্ব্বত্র ফুটন্ত ধুরফুলের প্রাচুর্য্য ও শোভা দেখে মনে হোল, সেদিন মনি বোসের আড্ডায় যারা বল্‌ছিল যে, বাংলাদেশের বনে ফুল তেমন নেই, তারা বাংলাদেশ সম্বন্ধে

কতটুকু জানে? ক্রোকাস, মার্গারেট্, কি কর্ণফ্লাওয়ার এখানে ফোটে না বটে—কিন্তু যেদিকে চোখ তাকাই, সেদিকেই এই যে প্রস্ফুট নীলাভ শুভ্রবর্ণের ধুরফুলের অপূর্ব্ব সমাবেশ—এর সৌন্দর্য্য কম কিসে? কি প্রাচুর্য্য এই ফুলের—ঝোপের নীচেও যে ফুল—সেখান থেকে থাকে থাকে উঠেচে ঝোপের মাথা পর্য্যন্ত আগাগোড়া ভর্ত্তি। এত নীচু ও অত উঁচুতেও ফুল কি করে গেল তাই ভাবি। ঋতুতে ঋতুতে কত কি ফুল ফোটে আমাদের দেশের বনে ঝোপে, আমার দুঃখ হয় এর সন্ধানও কেউ রাখে না, নাম পর্য্যন্ত জানে না। অথচ সুন্দরকে যারা ভালবাসে—তারা বাংলার নিভৃত মাঠ, বনঝোপের এই অনাদৃত অথচ এই অপূর্ব্ব সুন্দর ফুলকে তারা কখনো ভুলবে না।

বেলেডাঙ্গায় গিয়ে সেক্‌রার দোকানে বসে গল্প করলাম। ছোট্ট খড়ের ঘরে দোকান। বাঁশের বেড়া। ননী সেক্‌রার মেজ ছেলে বিড়ি বাঁধ্‌চে—তার দোকানঘরের সাম্‌নে একটা নতুন কামার-দোকান হয়েচে—সেখানে হাল পোড়াচ্চে। হালের চারধারে ঘুঁটের সনসনে আগুনে অনেক লোক বসে আগুন পোয়াচ্চে। দোকানের পিছনের বেড়ায় ধুরফুল ফুটে আছে। যেদিকে চাই সেদিকেই এই ফুল—এক জায়গায় মাঠের মধ্যে থাকে থাকে কতদূর পর্য্যন্ত উঠেচে এই ফুলের ঝাড়। রাঙা রোদ ও রাঙা সূর্য্যাস্ত শীতকালের নিজস্ব। এমন অস্ত আকাশের শোভা অন্য সময় দেখা যায় না।

যুগল বোষ্টমের সঙ্গে দেখা ফিরবার পথে—সে বল্লে তার চলচে না আমি তার G.T. পড়বার ব্যবস্থা করে দিতে পারি কিনা।

কাল আবার ক্যাম্প টুলটা নিয়ে কুঠীর মাঠের নিভৃত বনঝোপের ধারে গিয়ে বসলুম। ধুরফুল কি অপূর্ব্ব শোভাতেই ফুটেচে। পাখী এত ভালবাসি কিন্তু কাক ছাড়া কল্‌কাতাতে আর কোনো পাখী নেই—এখানে কত কি অজস্র পাখীর কলকাকলি, গাছপালা বন ঝোপের কি সীমারেখা, যেন নৃত্যশীল নটরাজ, ওপারের কাশচরে শিমূলগাছটা দেখা যাচ্চে, নীলাকাশে রৌদ্র ঝলমল করচে। একটা বাব্‌লাগাছের ফাঁক দিয়ে চাইলে কোন অজানা দেশের কথা মনে আনে—শীতের অপরাহ্ণে বাংলার এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তে যে কি সৌন্দর্য্য ভরে থাকে, চোখে না দেখলে সে বোধহয় নিজেই বিশ্বাস করতুম না। আর দেখলাম এক

জায়গায় বসে থাকলে অনেক বেশী আনন্দ পাওয়া যায়। ভাল করে সে জায়গায় রস অনেক বেশী পাওয়া যায়—কোথায় লাগে গালুডি, কোথায় লাগে কাশ্মীর, কোথায় লাগে ইটালি—আমার মনে কতটুকু আনন্দ ও চিন্তা সে জাগাতে পারে এই যদি প্রাকৃতিক দৃশ্যের উৎকর্ষের পরিমাপক হয়—তবে আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি ইছামতী তীরের এই নিভৃত বনঝোপ, ধুরফুল-ফোটা মাঠের, রাঙা রোদখানা শিমূলগাছের, বনপাখীর এই কল কাকলির অপরূপ সৌন্দর্য্যের তুলনা নেই। যে পরিদৃশ্যমান আকাশের এক-তৃতীয়াংশে দেড় লক্ষ Super Galaxy আছে এখানে বসে বসে ভেবে দেখলুম; সে সব বড় বিশ্বের মধ্যে কি আছে না আছে জানি নে—তবে এখানে যা আছে, সেখানেও তাই আছে বলে মনে হয় What is in mirocosm is also in macrocosm—সে সব দার্শনিক আলোচনা এখন থাকুক, বর্ত্তমানে এই সুবৃহৎ বিশ্বের এককোণে ধুরফুলফোটা বনঝোপের পাশে ক্যাম্পটুলটা পেতে বসে একটু আনন্দ পাচ্ছি পাই।

অনেক বেলা গেলে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলাম। একটু আগেই যেতাম, খুকু বসে ছিল, বল্লে একটু দেরী করুন, আরও বেলা যাক্। খুব জোর পায়ে হেঁটে পৌঁছে গেলাম বেলেডাঙার সেক্‌রার দোকানে—মধ্যে এই ধুরফুল-ফোটা বিশাল মাঠটা যেন এক দৌড়ে পার হয়ে গেলাম। তারপর ননী সেক্‌রার কত গল্প শুনলাম বসে বসে। তার ন'টা গরু ছিল, আর বছর ফাগুণ মাসে একে একে সব ক'টা মরে গেল গাল-গলা ফুলে। দোকানের সামনে একজন লোক বসে হাল পোড়াচ্ছে আর অত্যন্ত খেলো ও বাজে সিগারেট টানচে। আমি বল্লাম, ও খেয়ো না, ওতে শরীর খারাপ হয়। বল্লে, আমি খাইনে বাবু, এক পয়সায় সেদিন হাটে কিনলাম ছ'টা—তাই এক একটা খাচ্ছি।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়েচে—কুঠীর মাঠের সুঁড়ি জঙ্গলের পথটা অন্ধকার হয়ে গিয়েচে, পথ দেখা যায় না। নদীর ধারে এসে দাঁড়ালাম আমাদের ঘাটে—ওপারে একটা নক্ষত্র উঠেচে—সেটার দিকে চেয়ে কত কথা যে মনে পড়ল! ঐ Super Galaxy-দের কথা—বিরাট Space ও নীহারিকাদের কথা—এই বন-ফুল ও পাখীদের কথা। কতক্ষণ সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম—এইনক্ষত্র-টার সঙ্গে যেন আমার কোন্ অদৃশ্য যোগ-সূত্র রয়েচে—বসে বসে এই শীতের সন্ধ্যায় এই ইছামতীতে কত কি ঘটেছিল পুরোনো দিনে, সে কথা মনে এল।

গৌরীর কথা মনে এল—তারপর অন্ধকার খুব ঘন হয়ে এল। আমি

ধীরে ধীরে উঠে বাঁশবনের পথ দিয়ে বাড়ী চলে এলাম। আজ দুপুরে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে আমার সেই পুরোনো জায়গায় বসলাম—সেই সেখান থেকে কুঠীর দেবদারু গাছটা দেখা যায়—কি অপরূপ শোভা যে হয়েচে সেখানে ফুটন্ত ধুরফুলের, তা না দেখলে শুধু লিখে বোঝানো যাবে না। এই যে আমি লিখচি, আমারই মনে থাকবে না অনেক দিন পরে,—ওই ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে যাবে মনের মধ্যে। এরকম হয় আমি জানি—তবুও আজই দেখেচি, তাই নবীন অনুভূতির স্পর্দ্ধায় জোর ক'রে বলচি বনফুলের শোভায় এ প্রাচুর্য্য আমি দেখি নি। বিহারে নেই, সিংভূমে নেই, নাগপুরে নেই—এই বাংলা দেশের Sub tropical বনজঙ্গল ছাড়া গাছপালার এই ভঙ্গি ও ফুলের এই প্রাচুর্য্য কোথাও সম্ভব নয়। কেন যে লোকে ছুটে যায় বম্বে, দিল্লী, কাশী, দেওঘর তা বলা কঠিন! বাংলাদেশের এই নিভৃত পল্লী-প্রান্তের সৌন্দর্য্য তারা কখনো দেখে নি—তাই।

আজ বিকেলে টুনি, কাতু, জগো, বুধো এদের সঙ্গে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে বনঝোপের ধারে টুলটা পেতে বসলাম। রোদ ক্রমে রাঙা হয়ে গেল—একটা ফুল-ফোটা ঝোপের ধারে কতক্ষণ বসে রইলাম। তারপর একটা নরম কচি ঘাসে-ভরা জলার ধারে মুক্ত সান্ধ্য হাওয়ায় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছুটোছুটি খেলা করলুম কতক্ষণ—আমি এই সবই ভালবাসি, সাধে কি কলকাতা বিষ লাগে! এই শীতকালের সন্ধ্যায় এতক্ষণ ধোঁয়ায় সারা কলকাতা শহর ভরে গিয়েচে—আর এখানে কত ডাহুক, জলপিপি, দোয়েল, শালিকের আনন্দ কাকলী, কত ফুটন্ত বনফুলের মেলা, কি নির্ম্মল শীতের সন্ধ্যার বাতাস, কি রঙীন্ অস্তদিগন্তের রূপ, শিরীষ গাছে কাঁচা সুঁটি ঝুল্চে, তিত্তিরাজ গাছে কাঁচা ফলের থোলো দুলচে, জলার ধারে ধারে নীল কলমী ফুল ফুটেচে। মটর শাক, কচি খেঁসারি শাকের শ্যামল সৌন্দর্য্য—এই আকাশ, এই মাঠ, বন, এই সন্ধ্যায়-ওঠা প্রথম তারাটী—জীবনে এরা আমার প্রিয়, এদেরই ভালবাসি, এদেরই আবাল্য আমার অতি পরিচিত সাথী—এদের হারিয়ে ফেলেই তো যত কষ্ট পাই!

বিকেলে আজ বেলেডাঙার মরগাঙের আগাড়ে একটা নিরিবিলি জায়গায় এক বোঝা পাকাটির ওপর গিয়ে বসে ওবেলার সেই কথাটা চিন্তা করছিলাম

—ভগবান তাঁর পূজো না পেলে প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে ওঠেন না—ওঁর পূজোর সঙ্গে ভয়ের কোনো সম্পর্ক নেই—তাঁর যে পূজো, সে শুধু প্রেমের ও ভক্তির, এই পাড়াগাঁয়ে এদের সে কথা বোঝানো শক্ত। পূজোর ঘরে বসে আজ ওবেলা যখন শালগ্রাম পূজো করছিলাম, তখনই আমার মনে হোল, এই ঘরের বদ্ধ ও অমুক্তির পরিবেষ্টনীর মধ্যে ভগবান নেই, তাঁকে আজ বিকেলে খুঁজবো সুন্দরপুরের কিংবা নতিভাঙ্গার বাঁওড়ের ধারে মাঠে, নীল আকাশের তলায়, অস্তবেলার পাখীদের কলকাকলীদের মধ্যে। তাই ওখানে গিয়ে বসেছিলাম।

বসে বসে কিন্তু আজমাবাদের কথা মনে এল। এই পৌষ মাসে ঠিক এই সময়ে আমি সেখানে যেতুম, ঠিক এই বিকেলে রাঙা রোদের আভা মাখানো তিন টাঙার বনের ভেতর দিয়ে বটেশ্বরনাথ পাহাড়ের এপারে যেতুম ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াতে—কলাইক্ষেত থেকে কলাইয়ের বোঝা মাথায় মেয়েরা আনতো, গঙ্গার বুকে বড় বড় পাল তুলে নৌকা চলে যেত মুঙ্গেরের দিকে, ভীমদাসটোলায় আগুনের চারিধারে বসে গ্রামের লোকে গল্পগুজব করতো। ফিরবার পথে বাঁধের ওপর ওঠবার সময় দেখতুম চারিধারের মাঠ কুয়াসায় ভরে গিয়েচে—সেই ছবিগুলো মনে হোল। তার চেয়ে যে আমাদের দেশের ভূমিশ্রী, এই নির্জ্জন শান্তিতে ভরা অপরূপ সুন্দর পল্লীপ্রান্ত, ওই মরগাঙের শুকনো আগাড়ের নতুন কচি ঘাসের ওপর চরে বেড়াচ্চে যে গরুর দল, ওই দূরের বটগাছটা, মাঠের ওপারের বনফুল ফোটা বনঝোপ, এই ডাহুক পাখীর ডাক, গ্রামসীমার বাঁশবন—এসব যে রূপের বিত্তে নিঃস্ব তা নয়, বরং আমার মনে হয় এরা বিহারের সেই বৃক্ষলতাবিরল প্রান্তরের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধির, কিন্তু সেখানে একটা জিনিস ছিল, যে বাংলাদেশের এ অঞ্চলে অন্ততঃ নেই—Space! Wide open space! দূরবিসর্পী দিগ্বলয়, দূরত্বের অনুভূতি, একটা অদ্ভুত মুক্তির আনন্দ—এ যেমন পেয়েছিলাম ইসমাইলপুরের দিয়ারাতে ও আজমাবাদে—আর কোথাও তা মিলবে না।

আজ খুকু দুপুরে খানিকটা বসে রইল—আমি মাঠে বেড়াতে যাবো বলে গোপালনগরে গেলাম না। মরগাঙের আগাড়ে আজও অনেকক্ষণ গিয়ে বসেছিলাম। বেলেডাঙার পুলের কাছে ফিরবার পথে কি একটা বনফুলের সুগন্ধ বেরুল—খুঁজে বার করে দেখি কাঁটাওয়ালা একটা লতার ফুল।

লতাটা আমি চিনি, নাম জানিনে। ননী সেকরার দোকানের কাছেই ঝোপটা। ননী কাদা দিয়ে রূপো গালাবার মুচি গড়চে। ওদের সঙ্গে খানিকটা গল্প করবার পরে নদীর ধারে এসে খানিকটা দাঁড়ালাম—ওপারে কালপুরুষ উঠেচে, নীল Rigel-এর আলো নদীর জলে পড়েছে। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় নিঃসঙ্গ একা দাঁড়িয়ে ওপারের তারাটার দিকে চেয়ে থাক্‌বার যে আনন্দ, যে অনুভূতি, তার বর্ণনা দেওয়া যায় না—কারণ অনুভূতির স্বরূপ তাতে বর্ণিত হয় না, অথচ কতকগুলো অর্থহীন কথা দিয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে অনুভূতির প্রকৃতি সম্বন্ধে লোকের মনে ভুল ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া হয়। এ অব্যক্ত অবর্ণনীয়।

আজ এই সন্ধ্যাতেই একটা উল্কাপাত দেখলাম—ওপাড়ার ঘাটের মাঝামাঝি আকাশে—প্রথমে দেখা, তার পর নীল ও বেগ্‌নি রং হয়ে গেল জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে—জলে ছায়া পড়ল। আমি অমন ধরণের উল্কাপাত দেখি নি।

আজ এখানে বেশ শীত পড়েচে। দুপুরের আগে ফুল ফোটা মাঠে বেড়াতে যাওয়া আমার প্রতিদিনের অভ্যাস। আজ আকাশ কি অদ্ভুত ধরণের নীল! কুঠীর সেই দেবদারু গাছটা, কানাই ডোঙ্গার গাছ, শিরীষ, তিত্তিরাজ কি সুন্দর যে দেখাচ্চে নীল আকাশের পটভূমিতে! মাঝে মাঝে দু'একটা চিল উড়চে বহুদূরের নীল আকাশের পথে! এসব ছবি মনে করে রাখবার জিনিস। কি আনন্দ দেয়, কত অননুভূত ভাব ও অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত করে এরা। প্রকৃতির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, নির্জ্জন স্থানে প্রকৃতির এই রূপ মনে নতুন ধরণের অনুভূতি ও চিন্তা এনে দেয়। এ আমি জীবনে কতবার দেখলাম—তার প্রমাণ পাই প্রতি সন্ধ্যায় আজকাল কুঠীর মাঠ থেকে ফিরবার পথে, নিভৃত সন্ধ্যায় আমাদের ঘাটে দাঁড়িয়ে ওপারের চরের আকাশে প্রথম-ওঠা দু'চারটা নক্ষত্রের দিকে যখন চেয়ে থাকি তখনই বুঝতে পারি। যে দেবলোকের সংবাদ তখন আমার মনের নিভৃত কন্দরে ঐ রিগেল্‌ বা অন্য অজানা নক্ষত্র বহন করে আনে সে গহন গভীর উদাত্ত বাণী অমৃতের মত মনকে বৈচিত্র্যময় করে, সাধারণ পৃথিবীর কত ঊর্দ্ধ লোকের আয়তনে মনকে উঠিয়ে নিয়ে যায় একমুহূর্ত্তে। এ একটা বড় সত্য। বড় বড় সাধক, কবি, দার্শনিক, সুরস্রষ্টা, চিত্রকর, শিল্পী—যাদের চিন্তা আর ভাব নিয়ে কারবার, এসত্যটা তাঁদের অজ্ঞাত নয়।

এজন্যেই এমার্সন বলেচেন, "Every literary man should embrace solitude as a bride". এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হিউ ওয়ালপোল গত জুলাই মাসের Adelphi কাগজে বড় চমৎকার একটা প্রবন্ধ লিখেচেন। নির্ব্বাসিত দান্তে বলেছিলেন, 'কি গ্রাহ্য করি আমি, যতক্ষণ আমার মাথার ওপর আছে নীল আকাশ আর অগণ্য তারকা লোক'। জার্ম্মাণ মিষ্টিক্ এক্‌হার্ট কখনো লোকের ভিড়ে বা শহরের মধ্যে থাকতে ভালবাসতেন না— তাঁর "Our heart's brotherhood" গাথাগুলির মধ্যে অনেক বার উল্লেখ আছে এ কথার।

ও কথা যাক্। আমি নিজের একটা ভুল আবিষ্কার করেচি, যাকে এতদিন বলে এসেচি ধুরফুল, তার আসল নাম হোল এড়াঞ্চির ফুল। ধুরফুল লতার ফুল, বিলবিলেতে ছিল, সাদা বড় বড় ফুল ফুটত—পুঁটিদিদি বলছিল। আজকাল আর দেখা যায় না। শ্যামলতা, ভোমরালতার ফুলও এসময় ফোটে। আগে নাকি আমাদের পাড়ার ঘাটে শ্যামলতার ফুল ফুটে বৈকেলের বাতাসকে মধুর অলস গন্ধে ভরিয়ে দিত—আজকাল সে লতাও নেই, সে ফুলও নেই।

কাল সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে কুঠীর মাঠে বেড়াতে বেড়াতে রঙীন্ অস্ত-আকাশের দিকে চেয়ে অন্ধকার আকাশের পটভূমিতে কত বিচিত্র ধরণের গাছপালার সীমারেখা দেখলাম—এদের এখানে যা রূপ, তা এক যদি ভারতবর্ষের মধ্যে মালাবার উপকূলে আছে, এবং আসাম এবং হিমালয়ের নিম্ন অঞ্চলের অধিত্যকায় থাকে—আর কোথাও সম্ভব বলে মনে হয় না।

ছোট এড়াঞ্চির ফুল সকলের ওপরে টেক্কা দিয়েচে। কাল যখন মাঠের মধ্য দিয়ে বেলেডাঙ্গার গোয়ালপাড়ায় গেলাম—উঁচুনিচু মাটী ও ভাঙা পাশে রেখে, ফুলফোটা বড় বড় বনঝোপের নীচে দিয়ে—কত কি পাখী বেড়াচ্চে ঝোপের নীচে শুকনো পাতার রাশির ওপরে। কাঁটাওয়ালা সেই সবুজ লতাটায় থোকা থোকা ফুল ফুটেচে—খুকু বল্লে, বনতারা। —নামটী ভারী সুন্দর, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারা গেল না ও কোন লতার কথা বলচে— আর চারিদিকে অজস্রসম্ভারে ঢেলে-দেওয়া ছোট এড়াঞ্চির ফুল। বনে ঝোপে, বাবলাগাছের মাথায়, কুলগাছের ডালে বেড়ার গায়, ডাঙাতে— যেদিকেই চাই সেই দিকে ওই সাদা ফুলের রাশি। আমি বাংলায়ও বনের এমন রূপ আর কখনো দেখি নি। যদি জ্যোৎস্না রাত্রে এই রূপ দেখতে পেতাম!

এ ক'দিন ছিলাম কল্‌কাতায়। ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির প্রদর্শণীতে এবার নন্দলাল বসুর দু'খানি বড় সুন্দর ছবি দেখে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। খুকু ও জাহ্নবীর মেয়ে খুকী সঙ্গে ছিল—তারাও দেখেছে, তবে নন্দবাবুর ছবির তারা কি বুঝবে? ওদের দেখালুম বায়োস্কোপ, জু, সার্কাস্—আর এখানে ওখানে নিয়ে বেড়ালুম। একদিন সজনীদাসের বাড়ী, একদিন নীরদের বাড়ী, একদিন নীরদ দাসগুপ্তের ওখানে। দুঃখ হোল যে এখানে এসময়ে সুপ্রভা নেই।

কাল নৌকায় বনগাঁ থেকে এলাম। কি অদ্ভুত রূপ দেখলাম সন্ধ্যায় নদীর। শীতও খুব। অন্ধকার হয়ে গেল। কল্‌কাতার হৈচৈ-এর পরে এই শান্ত সন্ধ্যা, ফুল-ফোটা বন, মাঠ, কালো নিথর নদীজল মনের সমস্ত সংকীর্ণ অবসাদ দূর করে দিয়েচে। চালতেপোতার বাঁকে বনের মাথার প্রথম একটী তারা উঠেচে—কত দূর দেশের সংবাদ আলোর পাথায় বহন করে আনচে আমাদের এই ক্ষুদ্র, গ্রাম্যনদীর চরে—আমার মনের নিভৃত কোণে।

ঘাটে যখন নামলুম, তখন খুব অন্ধকার হয়ে গিয়েচে। খুকু ও আমি জিনিসপত্র নিয়ে বাঁশবনের অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে বাড়ী এলুম, খুকু তো একবার ভয়ে চীৎকার করে উঠল কি দেখে। ভয়ের কারণ এই যে, এসময়ে আমাদের দেশে বাঘের ভয় হয়।

দুপুরে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে কুঠীর এদিকে বনের মধ্যে সেই যে ঢিবিটা আছে, সেখানে খানিকটা বসলুম—তারই পরে একটা নাবাল জমি, আর ওপারে সেই বটগাছটা। আকাশ কি অদ্ভুত নীল! ছোট এড়াঞ্চির ফুল এখনও ঠিক সেই রকমই আছে—ক'দিন আগে যা দেখে গিয়েচি, সে সৌন্দর্য্য এখনও ম্লান হয় নি। প্রায় পনেরো দিন ধরে এর সৌন্দর্য্য সমান ভাবে রয়েচে, এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি এ বড় আশ্চর্য্যের কথা। এমন কোনো বনের ফুলের কথা আমার জানা নেই, যা ফুটন্ত অবস্থায় এতদিন থাকে। বালজ্যাকের গল্পটা (Atheists' Mass) তখনই পড়ে সবে বেড়াতে গিয়েচি। আকাশ যেন আরও নীল দেখাচ্ছিল, বনফুল-ফোটা ঝোপ আরও অপরূপ দেখাচ্ছিল। নাইতে গিয়ে বাঁশতলার ঘাট পর্য্যন্ত সাঁতার দিয়ে এলাম।

বিকেলে ক্যাম্প-টুলটা নিয়ে গিয়ে কুঠীর সেই ঢিবিটাতেই অনেকক্ষণ বসে রইলুম—রোদ রাঙা হয়ে গেল, ওপারের। শিমূলগাছটায় মাথার ওপর

উঠে গেল, তখনও আমি চুপ করে বসেই আছি। (কি ভয়ানক শীত পড়েচে এবার। এই যে লিখ্‌চি আঙুল যেন অবশ হয়ে আসচে।) আমার সামনে পেছনে ফুল-ফোটা সেই ঝোপ বন, পাশেই নদী। একবার ভাবলুম বেলে-ডাঙ্গায় যাবো, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উঠতে পারা গেল না এই সৌন্দর্য্যভূমি ছেড়ে।

নির্জ্জন সন্ধ্যায় প্রতিদিনের মত নদীতীরে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর পারের দ্যুতিলোকের দিকে চুপ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—ওপারের চরের ওপরে উঠেচে কালপুরুষ, তারপর এখানে ওখানে ছড়ানো দু' চার দশটা তারা। এই নিভৃত সন্ধ্যার আনন্দ সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক—আমি দেখেচি কুঠীর মাঠের যে আনন্দ তার প্রকৃতি Æsthetic, কিন্তু এই জনহীন নদীতীরে কুঁচঝোপ, বাঁশবন, ওপারের খড়ের মাঠ, এদের সবার ওপরকার ওই দ্যুতিলোক যে বাণী প্রাণে এনে পৌঁছে দেয়, তা বিশ্বলোকের এবং অন্তরলোকের যিনি অদৃশ্য অধিদেবতা, তাঁর বাণী—আজকাল যেন তার প্রকৃতি একটু একটু বুঝতে পারি। আর আসলে বুঝতে ওইটুকু পারি বলেই তো তা আমার কাছে বাণী এবং পরম সত্য, নইলে তা মিথ্যে হোত। যা ধরতে পারি নে, বুঝতে পারি নে, আমার কাছে তা ব্যর্থ।

কাল দুপুরে রোদে পিঠ দিয়ে বসে অনেকগুলি ভাল ভাল ফরাসী গল্প পড়লাম। তারপর স্নানের পূর্ব্বে কুঠীর মাঠে বেড়িয়ে এলাম। যে জায়গাটাতে অনেকদিন যাইনি—সেই চারিদিক বনে ঘেরা ধুরফুল ফোটা ঝোপের বেড়া দেওয়া মাঠের মধ্যে বসে রইলাম। শীতের দুপুরে নীল আকাশের রূপ, আর সূর্য্যাস্তের রূপ—এদের অন্য কোনো ঋতুতে দেখা যায় না। শীতকালে ইসমাইলপুর আর আজমাবাদের দিগন্তব্যাপী মাঠের প্রান্তে রাঙা সূর্য্যাস্ত দেখে ভাবতাম এ বুঝি বিহারের চরের নিজস্ব সম্পত্তি—কিন্তু এবার দেখলাম বাংলাদেশেও অমনি রক্তাভ অস্তদিগন্ত স্বমহিমায় প্রকাশ পায়। আজ বিকালেও সূর্য্যাস্তের শোভা দেখবার জন্যে কুঠীর মাঠে গিয়ে একজায়গায় কটা রোদপোড়া ঘাসের ওপর গায়ের আলোয়ানখানা বিছিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। ডাইনে একটা বাব্‌লাগাছের শুক্‌নো মগ্‌ডালে অনেক পাখী এসে বসে যেন নামজাদা চীনে চিত্রকরের একটা ছবি তৈরী করেচে। সাম্‌নের বনঝোপে, কুঠীর শিরীষ গাছে রোদ ক্রমে রাঙা হয়ে এল, নীল আকাশের কি রূপ! বারাকপুরে আর হয়তো কখনো আসবো না—কুঠীর

মাঠ আর দেখবো কি না কি জানি? আজকার এই অপরাহ্ণ যেন চিরদিন মনে থাকে—এর সুখ, আনন্দ ও এর দুঃখ। মাঠ থেকে উঠে গেলাম গঙ্গাচরণের দোকানে—সেখানে সবাই বসে দেশবিদেশের গল্প করচে। অশ্বিনী যাত্রা দলের বাজিয়ে, এখানেই ঘর বেঁধে বাস করে। তার বাড়ী পূর্ণ গোঁসাই বলে একটা লোক এসেছিল—সে এখানে এসে গল্প করে গিয়েচে যে, সে বিলেত ঘুরে এসেচে। প্রমাণস্বরূপ বলেচে কোথায় নাকি প্রকাণ্ড পিতলের মূর্ত্তি সে দেখেচে—এ দ্বীপে একখানা পা, আর একটা দ্বীপে আর একখানা পা—তার তলা দিয়ে সে জাহাজে ক'রে গিয়েচে। এ একটা অকাট্য প্রমাণ অবিশ্যি যে, সে লোকটা বিলেত গিয়েছিল!

আজই যাবার কথা ছিল কিন্তু খুকু বল্লে, আজ থাকুন। গত শনিবারে খুকুদের বাড়ী বারাকপুরে গিয়েছিলাম। ও দাঁড়িয়ে রইল পৈঠেতে আসার সময়। সকালে গোঁসাই বাড়ীর পাঠশালা Examine করতে গেলাম। বোষ্টম বুড়ীর বাড়ীর সামনে বড় বটগাছের তলায় যুগল বসে কথা বলচে একজন বৃদ্ধ মুসলমানের সঙ্গে। বৃদ্ধ বলচে, 'আমাদের দিন পার হয়ে গিয়েচে, বেলা চারটে, এখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পথ দেখাও, পথ দেখাও।' কথাটা আমার বড় ভাল লাগল। দুপুরে আটির ধারে মাঠে যেমন রোজ বেড়াতে যাই, আজও গেলাম। দুপুরের আকাশ যেমন নীল, অপরূপ নীল—এমন কিন্তু অন্য কোনো সময়ে পাই নি। দুপুরের পরে খুকু এসে অনেকক্ষণ ছিল। তাই দুপুরে কিছু লেখা হয়ে উঠল না। বিকেলে আমি গিয়ে কুঠীর মাঠে একটা নিভৃত স্থানে গায়ের আলোয়ানখানা ঘাসের ওপর বিছিয়ে তার ওপর চুপ করে বসে রইলাম। এতে যে আমি কি আনন্দ পাই! একটা অনুভূতি হোল আজ, ঠিক সেই সময় রাঙা রোদ ভরা আকাশের নীচের গাছপালায় আকা-বাঁকা শীর্ষদেশ লক্ষ্য করতে করতে।

সকালে উঠে নৌকাতে আবার বনগাঁয়ে যাচ্চি। জলের ধারে ধারে মাছরাঙা পাখী বসে আছে নলবনে। কাঁটাকুমুরে লতায় থোকা থোকা সুগন্ধ ফুল ধরেচে। তবে ফুলের শোভা নেই, গন্ধই যা আছে।

বড়দিনের ছুটি শেষ হোল। আবার কল্‌কাতায় ফিরতে হবে। কে জানে, কবে আবার দেশে ফিরতে পারব!